প্রার্থনা।

ওহে শক্তিধারী প্রভু! এই পুণ্য মাসে,
কেমনে ডাকিব তোমা' কাঁপে প্রাণ ত্রাসে।
আমি যে স্বর্গের জীব কিবা চিহ্ন তার,
নিশি দিন কাটে শুধু করি হাহাকার,
মরণের পারে যেই অমৃত সাগর,
তাহাতে ডুবায়ে প্রাণ শুদ্ধ শান্ত কর।

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু।

আমরা কি চাই।

(১)

"আমরা" কথাটী বড় বিস্তৃত। "আমরা" কারা? জগতের সমস্ত সৃষ্ট বস্তু কি? না কেবলমাত্র এই পৃথিবীর প্রাণিজগৎ? এত বিস্তীর্ণ অর্থে কথাটী এখানে ব্যবহার করিতেছি না। এ প্রবন্ধের "আমরা" কেবল বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীরা। বাঙ্গলা এখানে ভারতের সেই অংশটুকু যেখানকার অধিবাসীরা সাধারণতঃ বাঙ্গলা ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে। এ "আমরার" বর্ণভেদ বা ধর্ম্মভেদ নাই। ব্রাহ্মণ হইতে নিম্নতম জাতি পর্য্যন্ত হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, আবাল বৃদ্ধ বণিতা যাঁহারা সচরাচর বাঙ্গলাভাষায় কথা-বার্ত্তা কহিয়া থাকেন তাঁহারা সকলেই এই "আমরার" ভিতর। যদি বাঙ্গালি-জাতি বলিয়া কিছু থাকে তাহার সকল লোকই এই "আমরার" অন্তর্ভূত।

এখন কথা হইতেছে আমরা কি চাই। বেশী কিছু চাইনা! কেবল সকল জীবের যে প্রাথমিক সংস্কার তাহার বশবর্ত্তী বলিয়া আমরাও বাঁচিতে চাই। ইহাতে কি আমাদের বেশী দোষ দেওয়া যাইতে পারে? বলিতে পারি না। মনে হয় যদি আমাদিগকে জীব বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে আমাদের সাধারণ জীবধর্ম্মের বশ-বর্ত্তিতাকে দোষ বলিয়া ধরা না যাইলেও যাইতে পারে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—তোমাদের বাঁচিবার অধিকার কি? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি কি জানি না। এই মাত্র বলিতে পারি যখন দুর্ভাগ্যক্রমে জন্মিয়াছি তখন বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক।

বাঁচিবার ইচ্ছা আমাদের হৃদয়ে খুব প্রবল। কিন্তু এ পোড়া জগতে মনে করিলেই বাঁচা যায় না। তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি? কবি ঠিকই বলিয়াছেন "জীবন রাখিতে জীবনান্ত।" উহা রাখিতে গেলে ঢের কাঠ খড়ের আবশ্যক। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব আর বাঁচিয়া থাকিব তাহা হয় না। বিস্তর চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াও অনেক সময় বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠে। এ অবস্থায় আমরা

যদি বাঁচিয়া থাকিতে চাই আমাদের কতকগুলি জিনিষের প্রয়োজন হইবে। সমস্ত জিনিষগুলির তালিকা প্রস্তুত করন আমার বিদ্যা বুদ্ধির বাহিরে, তবে মোটামুটি দুই চারিটির নাম করিতে পারি। তাহা হইতেছে (১) আহার (২) স্বাস্থ্য (৩) শিক্ষা (৪) ধন। জীবন হইতেছে সংগ্রাম বিশেষ। এ সব সরঞ্জামের বন্দোবস্ত না হইলে দেহ ও আত্মা একত্রে রাখা মানুষের সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। এখন ইহাদের সম্বন্ধে গোটাকতক কথা বলিতে চাই।

১। আহার। ইহার আবশ্যকীয়তা বুঝাইতে বেশী প্রয়াস পাইতে হয় না। জীবের প্রধান কাজ আহার অন্বেষণ। এ চেষ্টা তার সঙ্গের সাথী। জন্মাইবার পরক্ষণ হইতে আমরা আহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই, এবং জীবন ত্যাগের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাতে নিযুক্ত থাকি। এ আহার আমাদের প্রচুর আছে কি? প্রচুর থাকা ত দূরের কথা, দেশের কত লোককে যে অর্দ্ধাশন করিয়া থাকিতে হয় তাহার কোন হিসাব আছে কি? কয় জন পুরা আহার পায়? দুই এক কথা বলিলেই বিষয়টা সহজে বুঝা যাইতে পারে। উপর দিক হইতে দেখা যাউক। দেশের মধ্যবিত্ত ও গৃহস্থ যাঁহাদের বলি তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ? ইঁহাদের অধিকাংশরই মাসে ২৫।৩০ টাকার বেশী আয় নয়। ইঁহারা অনেকেই ভদ্র নামে আখ্যাত। ইঁহাদিগকে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিতে হয়। ইঁহাদের অনেকেরই পোষ্যের সংখ্যা পাঁচ সাতটির কম নয়। ৩০ টাকায় পাঁচ ছয়টি লোকের গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতে হইলে গড় পড়তা পড়ে ৬ টাকা কি ৫ টাকা। আজ কালকার কথা ছাড়িয়া দিই, সুজন্মার বৎসরেও এখন অনেক স্থানে মোটা চাউলের দর ৩।৩৷৷০ টাকার কম নামে না। বামাবোধিনীতে স্থানাভাব, বেশী কথা বলিতে চাই না। পাঠক পাঠিকায়া অবস্থাটা কি সঙ্কট একবার ভাবিয়া দেখুন। মধ্যবিত্ত লোকদের কথা ছাড়িয়া দিয়া একবার চাষাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাউক। কেহ কেহ বলেন বাঙ্গালার চাষাদের অবস্থা বড় ভাল। প্রজাসত্ত্ব আইনের কল্যাণে এবং অন্য দুই এক কারণে ভারতের অন্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালার কৃষকদের অবস্থা যে অপেক্ষাকৃত ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু মোটের উপর তাহা যে বিশেষ ভাল তাহা নয়। সম্পন্ন কৃষক যে দেশে নাই এ কথা বলিতে চাই না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে চাই ইহাদের পরিমাণ কত? দেশের কয়জন চাষার অবস্থা স্বচ্ছল? কয়জন ঋণজালে জড়িত নয়? কয়জন নিজের বা পরিবারের কাহারও ব্যারাম হইলে ২।১০ টাকা খরচ করিয়া চিকিৎসা করাইতে পারে? যে বৎসর ফসল ভাল হয় ইহারা দিন কয়েক একটু স্বচ্ছলে কাটায় বটে, কিন্তু অজন্মা হইলে ইহাদের অবস্থা যে কি শোচনীয় হইয়া উঠে তাহা বর্ণনা করা যায় না।

এখন একবার দেশের শিল্পজীবিদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাউক। ইংরাজেরা পর্য্যন্তও বলিতেছেন যে, বিদেশীয় প্রতিযোগিতায় দেশের শিল্প এক প্রকার ধ্বংস পাইয়াছে, এবং শিল্পিশ্রেণী অন্যোপায় হইয়া প্রায় সাধারণ শ্রমজীবীতে পরিণত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে কর্ম্মকার, সূত্রধর প্রভৃতির অবস্থা একটু ভাল দেখিয়া কেহ যেন ভ্রমে পতিত না হন। কাপড়ের কথা ছাড়িয়া দিই, অনেক সামান্য লোহা ও পিতলের জিনিষ ও আজকাল বিদেশ হইতে আসিতেছে। একটা কথা বলিলেই সহজে অবস্থাটা বুঝা যাইবে। পূর্ব্বে যখন সহর ও গণ্ড-গ্রাম অঞ্চলে গন্ধকের দেশলাই চলিতেছিল, তখন দেশের নিদান অনকয়েক লোক ও উহা তৈয়ারি করিয়া একরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এখন বিদেশী দেশেলাইএর আগমনে তাহাদের ব্যবসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পোড়ানর তেলটুকু পর্য্যন্ত আর দেশে হয় না; বিদেশ হইতে কেরোসিন আসিয়া তার স্থান অধিকার করিয়াছে। সুদূর পল্লিগ্রামেও এখন পিতল কাঁসার বাসনের স্থানে অনেকটা বিদেশী এনামেলের বাসন প্রচলিত হইয়াছে। এ সব কি দেশীয় শিল্পজীবিদের অবস্থার উন্নতির পরিচায়ক? যদি পুরাতন শিল্পের স্থানে নূতন শিল্প প্রচলিত হইয়া থাকে তাহা হইলে কথা স্বতন্ত্র হইতে পারে। কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন তাহা হইয়াছে। এখন একবার সামান্য শ্রমজীবিদের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক। স্থানবিশেষে ইহাদের কিছু সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু সাধারণত ইহারা প্রত্যেক রোজ ৩।৪ আনার বেশী কিছুতেই উপায় করিতে পারে না। যদি কাজের অভাব না হয়, এবং কখন কখন কাজে অপারগ না হয় তাহা হইলে ইহাদের প্রত্যেকের মাসিক আয় ৭॥০ টাকার বেশী হইতে পারে না। ইহাদের সকলেরই প্রায় দুই চারিটী করিয়া পোষ্য আছে। কোন কোন স্থানে ইহাদের স্ত্রীলোকেরা ও ছোট ছেলেরা কাজ পাইলে কিছু কিছু উপার্জ্জন করে বটে; কিন্তু খুব কম স্থানেই এরূপ সুবিধা জুটে, এবং জুটিলেও সকল অবস্থায় তাহা উহারা গ্রহণ করিতে পারে না। ঐ সুবিধা হইলেও তাহা হইতে আর ৫।৭ টাকা উপায় না হয় হইল। তাহাতেও এক পরিবারের মোট আয় ১২।১৪ টাকার বেশী হয় না। যদি চার পাঁচটি প্রাণীর এই আয়ের উপর নির্ভর হয় তাহা হইলে প্রত্যেকের ভাগে মাসে পড়ে কত? বেশী কিছু বলিবার আবশ্যক নাই; ব্যাপারটা কিরূপ সঙ্গিন সহজেই উপলব্ধি হইবে। যদি কাহারও মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় তাঁহাকে তাঁর ঝি চাকরদের অবস্থাটী ভাবিয়া দেখিতে পরামর্শ দিই। খাওয়া পরা ছাড়া মাসিক ৩।৪ টাকা মাহিনার অধিক তাহারা কেহ কি পাইয়া থাকে? উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে দেশের অধিকাংশ লোকের অবস্থার

আভাস কতকটা পাওয়া যাইতে পারে।

আর এক কথা বলিবার আছে। আহার প্রচুর হইলেই হইল না। জীবন রক্ষার জন্য তাহা পুষ্টিকর হওয়া আবশ্যক। কেহ যদি পেট ভরিয়া দুই বেলা ভাত ও তাহার উপর একটু লবণ ও ডাইল বা একটা তরকারী পাইল তাহা যে তার পক্ষে যথেষ্ট হইল ইহা মনে করা ভুল। মাংস আমাদের দেশে সেরূপ প্রচলিত নাই; এবং উহার আবশ্যকতা এখানে বেশী না হইতে পারে। দুধ ও মাছ আমাদের মধ্যে পুষ্টিকর আহার বলিয়া গণ্য। কিন্তু নিজেদের কথা দূরে থাকুক দেশে কয়জন পিতা মাতা আছে যাহারা আজ কাল তাদের নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকেও উপযুক্ত পরিমাণে দুধ দিতে পারে? কিছু দিন পূর্ব্বে পাড়াগাঁয়ে অনেক গৃহস্থের দুই একটি গাভী থাকিত, কিন্তু নানা কারণে আজ কাল এ প্রথা ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। মাছের অবস্থা তথৈব। দেশে মাছ বিশেষরূপ কমিয়া গিয়াছে। কোন খানেই আর পূর্ব্বের ন্যায় মাছের জোগান নাই। পূর্ব্ববঙ্গ চিরকালই মৎস্যবহুল প্রদেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু সে অঞ্চলেও আজ কাল পূর্ব্বের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে মৎস্য পাওয়া যায় না। আমাদের উপযুক্ত আহার্য্য দ্রব্যের অপ্রতুলতা সম্বন্ধে এখানে আর কিছু বলিবার আবশ্যক দেখি না।

২। স্বাস্থ্য। দেশের মধ্যে ভাল স্বাস্থ্য কয় জনের আছে? একেত বাঙ্গলা দেশের জল বায়ু স্বভাবতঃই ভাল নয়, তাহার উপর আজ কাল খুব কম জেলাই আছে, যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নাই; জোর দুই পাঁচটি জেলার অবস্থা একটু ভাল বলিয়া মনে হয়। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দেখুন কতগুলি সুস্থ ও সবলকায় বালক বালিকা দেখিতে পান। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ সবলদেহ যুবক যুবতী দেখিতে পাওয়া যাইত, এখন যে তাহা আর দেখা যায় না, তাহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। খুঁজিয়া দেখিলে এখন কয়খান গ্রামে ৭০।৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ নরনারী নয়নে পড়ে? যে দুই এক জন আছে তাঁহারা রোগে ও শোকে একরূপ জীবন্মৃত। আনন্দময় বৃদ্ধ-মুখ আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। ম্যালেরিয়ার উৎপাতে কত গ্রাম যে একেবারে উজাড় হইয়া গিয়াছে তাহা বলা যায় না। একটা পুরাতন নগরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় চারিদিকে নিরানন্দ-পূর্ণ; পোড়ো বাড়ীর সংখ্যা বড় বেশী। ওলাউঠা, বসন্ত এবং আজ কাল প্লেগেও মানুষ বেশ মরে, কিন্তু ম্যালেরিয়ার সঙ্গে তুলনায় ইহারা সকলে একত্রে ও গণনার মধ্যে আসে না। সরকারী বিজ্ঞাপনী সব সময় ঠিক নয়, কিন্তু ইহা হইতেও বুঝা যায় ম্যালেরিয়ায় আমাদের কি সর্ব্বনাশ করিতেছে। মফস্বল ছাড়িয়া যদি সহরের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে কোথাও কি আশাপ্রদ দৃশ্য চক্ষে পড়ে? অধিকাংশ সহরেরই

স্বাস্থ্য খারাপ। বসতী বড় ঘন; পানীয় জল ও বিশুদ্ধ বাতাসের অভাব সর্ব্বত্রই। দুই একটা সহরে কেবল কলের জলের ব্যবস্থা আছে। এই কথা শুনিয়া সহরবাসীরা যেন মনে না করেন যে, মফস্বলে জল কষ্ট নাই। যে সব স্থান নদীতীরস্থ সেখানে উহা অপেক্ষাকৃত কম বটে, কিন্তু আর সব স্থানে খুব বেশী। আর নদীও অনেক মজিয়া যাইতেছে। সহরাদির অবস্থা যদি ভালই হয় তাহাতেই বা বিশেষ আসে যায় কি? দেশের কয়জন লোক সহরে বাস করে? সহরে সুবিধার মধ্যে এই, রোগ হইলে চিকিৎসক মিলিতে পারে; মফস্বলে অনেক স্থানে মোটে মিলে না। ফল এই দাঁড়াইয়াছে—যাঁহারা সহরের বাস বহন করিতে সক্ষম সুবিধা পাইলেই তাঁহারা দেশ পরিত্যাগ করিয়া যান। অধিকাংশ লোকে অবশ্য তাহা পারে না, তাঁদের "গয়া গঙ্গা গদাধর।"

(ক্রমশঃ)

অমলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অমলার যত্নে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া অমিয় যেন রোষভরে কহিলেন, "বৌদিদি! তিনি কি নিষ্ঠুর! এত দিনের মধ্যে একটা সংবাদ দিতেও কি তাঁর এত কষ্ট বোধ হয়! তিনি সুখে থাকুন; আমি তাঁর সুখের কণ্টক হ'তে ইচ্ছা করি না।"

অমলা কহিলেন, "অমিয়! সম্ভবতঃ তিনি এমন কোন বিপদে পড়েছেন যে, পত্র লিখিবারও উপায় নাই। অকারণে তাঁকে দোষ দিও না।"

অমলার কথা অমিয়র মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিল। তাঁহার রোষ, অভিমান বিজলীর ন্যায়, বর্ষণোন্মুখ বারিদ-প্রতিম মুখমণ্ডলে বিলীন হইয়া গেল। অমিয় শিশুর ন্যায় রোদন করিয়া অধীরা হইলেন। অশ্রু তাঁহার গণ্ড ও বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া স্ফটিকসলিলা স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রতীয়মাণ হইতে লাগিল। তিনি বাষ্পোপরুদ্ধকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—"বৌদিদি! তবে হয় তো আমারই জন্য তাঁর এই বিপদ উপস্থিত। আমি নিজেকে বিধবা জ্ঞানে এতদিন মাথায় সিন্দুরটী পর্য্যন্ত দিইনি, হাতের লৌহবলয় পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছি। এতেই হয় তো তাঁর বিপদ হয়েছে।"

অমিয়র আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মুখে বাক্য উচ্চারণ করিতে সক্ষম হইলেন না। মুখে যাহা বলিতে অভিলাষ করিয়া ছিলেন, নীরব অশ্রু ও দীর্ঘ নিশ্বাস তাহা বলিয়া দিল। আহা! অমিয়র এই রোষ, অভিমান ও অশ্রুর মধ্যে কত মাধুর্য্য! বিশুদ্ধ প্রেম যেখানে, ক্রোধ ও অভিমান সেই খানেই বর্ত্তমান। এই প্রেম ও ভালবাসার কথা ভাবিতে গেলে গৌরাঙ্গের ভগবানের উপর ক্রোধ ও অভিমানের কথা মনে পড়ে। অমিয়র ক্রোধ ও অভিমান রামপ্রসাদের "মা মা

বলে আর ডাকবনা" রই অনুরূপ। আবার নিমেষ মধ্যেই ধ্রুব ও শ্রীরাধার ব্যাকুলতা। ক্ষণকাল এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর, অমলা কহিলেন,—"অমিয়! কাঁদিলে কি হবে বোন্! এখন শোক, দুঃখ সব চেপে রেখে সাহসের সহিত কার্য্য করতে হবে।"

অমিয়।" বৌদিদি! দাদা ও তিনি যে কোথায় আছেন সে কথা তো সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করা হলো না।"

অমলা। "এখনও আমাদের ভাগ্যে অনেক কষ্ট আছে, সেই জন্য এ কথা জিজ্ঞাসা করবার পূর্ব্বেই তিনি অন্তর্দ্ধান হলেন। তবে আমাদের অনেক সৌভাগ্য যে এমন সাধুপুরুষের দর্শন লাভ হলো।"

অমিয়। দর্শন লাভেও তো বিশেষ কোন ফল হলো না।

অমলা। আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই আমাদের আশা পূর্ণ হবে। তবে আমাদি'কে অনেক কষ্ট ভোগও করতে হবে; কারণ, তা না হলে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

অমিয়। বৌদিদি! আমি তো কোন পাপ করিনি। তুমিও তো দেখতে বাড়ীতে কাজকর্ম্ম করতাম, সময়ে কিছু আহার করতাম, আর মনে মনে সর্ব্বদা ভগবানকে নিজের দুঃখ জানাতাম। এতে কি এমন পাপ হলো যে ভগবান্ আমায় এত কষ্ট দেবেন। বৌদিদি! তুমি কি কোন পাপ করেছ?

অমলা। করেছি বৈকি; পাপ না করলে এত কষ্ট ভোগ করতে হবে কেন। শুধু যে এজন্মে পাপ করলে তার ফল ভোগ করতে হয়, তা নয়; পূর্ব্বজন্মে পাপ করলেও এ জন্মে তার দণ্ড ভোগ করতে হয়। নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মে হয় তো কারো মনে খুব কষ্ট দিয়েছিলুম, আজ তারই ফল ভোগ হচ্ছে।

অমিয়। এ কথা ঠিক বটে, বৌদিদি! আমিও তাহলে পূর্ব্বজন্মে কারো মনে কষ্ট দিয়েছি, আজ তাই এত মনকষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। যা হবার, তাতো হয়ে গেছে, এখন কি করবে বল। এখানেই থাকবে, না অন্য কোন খানে যাবে?

অমলা। আমি বলি কি, যে কোন উপায়ে হ'ক কালীঘাটে যেতে হবে। ছেলে বেলায় আমাদের যখন অসুখ হতো মা কালীদেবীকে মানসিক করতেন; তাতেই অনেক সময় আমাদের অসুখ সেরে যেতো। সেখানে গিয়ে বেশ করে দেবীকে মনের দুঃখ জানাব। তারপর যা হয় করা যাবে। বুঝতে তো পারছিস, ভগবান্ ভিন্ন তো আমাদের কোন উপায় নাই। তিনিই যা করবেন তাই হবে।

অমিয়। তা হলে, বৌদিদি! কাল সকালেই যাওয়া যাবে। এখন চল তবে নবদ্বীপেই থাকা যাক্।

যুক্তি স্থির হইল; উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন রজনী ঘোরা; সৈকতভূমি ঝিল্লিরবে পরিপূর্ণ; তাঁহারা সন্ন্যাসীর বাক্যে হৃদয়ে সহস্রগুণ বল পাইয়াছেন।

একক্ষণে তাঁহারা—নবদ্বীপে যান ফিরি স্মরি জগদীশে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকরালীচরণ হাজরা।

নিবেদন পত্র।

মাননীয়া শ্রীযুক্তা * * * বসু
মহাশয়া-সমীপেষু।

১

আমি আজ জানি দেবি, "নলিনী *" কোথায়—
সেই যে রুচিরা মেয়ে
ললিতা ফুলের চেয়ে,
উষার সোণার ছটা আঁধার ধরায়!
আমি যে দেখেছি সেই,
দ্বাদশ বরষ এই,
তথাপি সে চাঁদ মুখ ভোলা নাহি যায়!

২

আমি জানি স্নেহময়ি, "নলিনী" কোথায়—
সরম সঙ্কোচ-মাখা,
পল্লবে গোলাপ ঢাকা,
হাসিতে জোছনা ভাসে অমৃত কথায়!
যেন সে বিশ্বের রাণী,
রূপে লক্ষ্মী গুণে বাণী,
সে যেন এ মরু দেশে বারিধারা প্রায়!

৩

আমি জানি স্নেহময়ি, "নলিনী" কোথায়—
মা বাপের পুণ্য দিয়া,
তনুখানি নিরমিয়া,
স্বরগ সৌরভে মাখি চাঁদের আভায়,
তারে পাঠাইলা বিধি,
তাই সে অমূল্য নিধি,
তাই তার সম আর মিলে না হেথায়!
আমি জানি দেবি, সেই "নলিনী" কোথায়।

৪

আমি জানি স্নেহময়ি, "নলিনী" কোথায়—
মা বাপ যতন করে,
দিলা তারে যোগ্যবরে,
মিলাইলা হরগৌরী—মাণিক সোণায়।
সুখের প্রবাহ ছোটে,
আনন্দ ফেণায়ে ওঠে,
উল্লাস-তুফানে বুঝি বিশ্ব ডুবি যায়!

৫

আমি জানি স্নেহময়ি, "নলিনী" কোথায়—
হা সৌভাগ্য!—শুভাদৃষ্ট!
কেন তুমি এত মিষ্ট,
যদি হেন খেলা ভাঙ্গি যাহ পুনরায়;
কেন লোকে তোমা তরে,
আজন্ম তপস্যা করে,
নির্ম্মম তামাসা তুমি—জল-বিম্ব প্রায়!

---

* নলিনী—স্বর্গীয় আনন্দ মোহন বসু মহাশয়ের স্বর্গবাসিনী জ্যেষ্ঠা কন্যা।

৬

আমি জানি স্নেহময়ি, "নলিনী" কোথায়—
এ যে কি শুনিনু কাণে,
বজ্র হানি তব প্রাণে,
ভাঙা বুক ভেঙে দিয়ে—বলিব কি হায়,
নলিনী গিয়াছে মরি!—
তা'কি হয়?—হরি! হরি!
সে মেয়ে কি পারে কভু কাঁদাইতে মা'য়?

৭

আমি জানি স্নেহময়ি, "নলিনী" কোথায়—
সে মেয়ে যে দেববালা,
করুণা মমতা ঢালা,
আপনার ভাই বোনে সে কভু কাঁদায়?—
সে যে পতিপ্রাণা সতী,
আকুল করিয়া পতি,
সোণার সংসার ফেলি, সে কভু পলায়?

৮

আমি জানি স্নেহময়ি, "নলিনী" কোথায়—
ভীষণ শ্মশান-মাঝে,
তার কি শয়ন সাজে,
গঙ্গা কি গিলিতে পারে কচি কমলায়?—
ননীর পুতলী সে তো,
অগ্নি কি নিঠুর এত,
তাহারে করিবে গ্রাস—রাক্ষসী ক্ষুধায়??

৯

তাহা নহে—স্নেহময়ি! নিবেদি তোমায়,
যে দেশ মরণহীন,
সুখময় চিরদিন,
রোগ শোক দুঃখ যথা পশিতে না পায়;
যথা মন্দাকিনী-জলে,
অমিয় লহরী চলে,
নন্দনে মন্দার ফোটে অনন্ত শোভায়;
নাহি পাপ নাহি তাপ;
নাহি দৈন্য, অভিশাপ,
বিষাদের অশ্রুকণা ঝরেনা যথায়;
পূরে সদা শুভ আশা,
স্বার্থহীন ভালবাসা,
আরাম অমৃত মাখা যথা সমুদায়,
সে দেশে পিতার কাছে,
নলিনী আনন্দে আছে,
দেব-কোলে দেব-বালা পরাণ জুড়ায়।

১০

দেবি! তব স্নেহরাশি "সঞ্জীবন" প্রায়,
সোণার নলিনী আজি সঞ্জীবিতা তায়;
দেখ তব কন্যারত্নে,
জগত রক্ষিছে যত্নে,
তার শুভ প্রীতি চিহ্ন মাখিয়াছে গা'য়;
তারি শোভা ফুলে ফুলে,
সাদরে রেখেছে তুলে,
তারি মধুরতা-মাখা প্রভাতের বা'য়;
চাঁদে মিশি চন্দ্রানন,
করে সুধা বিতরণ,
বিহগের কলকণ্ঠ তারি গীতি গায়;
সে নীল নয়ন দুটি,
ইন্দীবরে রহে ফুটি,
নদী সরোবর ভরা তারি স্নিগ্ধতায়;
মানবের সাধ আশা,
পূর্ণ তারি ভালবাসা,
উন্নতি মঙ্গল জাগে তারি মহিমায়;
এরূপে সে বহু বেশে,
বিরাজিছে মর দেশে,

অরূপে সে দেবী হয়ে আছে অমরায়,
আমি তারে নিত্য পূজি নীরব নিশায়।

আপনারই
শ্রীমা—

চা-পান।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য হইতে চা ইংলণ্ডে প্রচলিত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় চারল্‌সকে দুই পাউণ্ড চা উপঢৌকন দেন। সে সময়ে চার মূল্য ১৫৲ টাকা পাউণ্ড ছিল, ওঃরাজ-সভার বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই চা-পান করিতে সক্ষম ছিলেন। এখন সেই চা চারি আনা মূল্যের কমেও এক পাউণ্ড পাওয়া যায় এবং ইহা ইংলণ্ডে এত অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে যে, সাধারণের স্বাস্থ্যহানি বিষয়ে চিকিৎসকগণের বিশেষ শঙ্কা হইয়াছে।

ষ্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিনের (Strand Magazine) অধ্যক্ষগণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিলাতের বিখ্যাত চিকিৎসকগণকে ১১টী প্রশ্ন করেন। যে কয়েকটী প্রশ্ন করেন, তাহাদের মধ্যে 'চার' বিষয়ে একটী। প্রশ্নটী এই :—"আপনারা কি মনে করেন, এ দেশের লোকেরা অত্যধিক চা সেবন করে, এবং অপেক্ষাকৃত ভাল বা স্বল্পক্ষণ সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করা বিধেয় কিনা।"

সুবিখ্যাত ডাক্তার রবার্ট বেল, ডাঃ জন হ্যাডন, ডাঃ এনড্রু উইলসন (Dr. Robert Bell, Dr. John Hadden, Dr. Andrew Wilson) প্রভৃতি চিকিৎসকগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, বিলাতে লোকে অত্যধিক পরিমাণে চা সেবন করিয়া থাকে। এই প্রথা ঘোর অনিষ্টকর। চার মধ্যে ট্যানিন (Tannin) নামক একটী পদার্থ আছে যাহা বিষম অহিতকর। চা তিন মিনিট মাত্র সিদ্ধ করিয়া পাতাগুলি ফেলিয়া দিলে উহার সুগন্ধি ও উত্তেজক শক্তিপ্রদ গুণগুলি রক্ষিত হয়। স্বল্প মাত্রায় চা সেবন করিলে অল্প আহারীয় সামগ্রীর পরিমাণ কম হইলেও স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। চা যত ভাল হয় ততই ভাল।

ডাঃ সিব্‌লি (Dr. W. K. Sibley) বলেন যে, অধিক পরিমাণে চা সেবন করা অধিক মদ্যপানের ন্যায় দূষণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও অশেষ ব্যাধির নিদান হইয়াছে।

Dr. Andrew wilson সাহেব বলেন যে, সর্ব্বদা চা পান করা বর্ত্তমান যুগের একটী পাপ ও এই পাপ সমাজে যতই ব্যাপ্ত হইতেছে ততই স্নায়বীয় উৎকট রোগ সকলের প্রাদুর্ভাব হইতেছে।

যখন শীতপ্রধান ইংলণ্ডদেশে চা পান করিয়া লোকের এই দুর্দ্দশা উপস্থিত, তখন এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে—যেখানে চিরকাল

নারিকেলোদকাদি শীতল পানীয় ব্যবহার্য্য—সেই দেশে তাহার স্থলে চা পানে যে কি অনিষ্ট হইতেছে তাহা ভাবিবার বিষয়। অধুনা আমাদের দেশে চা এত অধিক পরিমাণে ও দূষণীয় প্রণালীতে প্রচলিত হইতেছে যে, সে সম্বন্ধে আমাদিগকে এখন হইতে বিশেষরূপে সতর্ক না হইলে পরিণামে বিষময় ফল অপরিহার্য্য। বহুদর্শী বিচক্ষণ চিকিৎসকের মতে উত্তম চা তিন মিনিট মাত্র সিদ্ধ করিয়া পান করাই ব্যবস্থা; অন্যথা চার যে সকল অপকারিতা, তাহা অলক্ষ্যভাবে শরীরে প্রবেশ করিবে ও ক্রমে পাকস্থলীকে বিকৃত করিবে। হাটে, ঘাটে, পথে, মাঠে, ধনীর অট্টালিকা হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র যেরূপ কদর্য্য প্রণালীতে ও অতিরিক্ত মাত্রায় চা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার ভীষণ পরিণাম ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। আমাদিগের মধ্যে এমন লোকও আছেন, যাঁহারা চা ভিন্ন আর কিছুই রুচিপূর্ব্বক আহার করেন না, এবং তাঁহাদের আহারের শক্তিও কমিয়া গিয়াছে। ক্রমাগত চা পান করিয়া তাঁহাদিগের পাকস্থলী প্রায় নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতা মহানগরীতে সচরাচর দৃষ্ট হয়—একই পাকপাত্রে ক্রমাগত চা সিদ্ধ হইতেছে। পথিমধ্যে যাহারা চা ফিরি করিয়া বিক্রয় করে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে, তাহারা দিনে দুইবার মাত্র চা প্রস্তুত করে; এক বার প্রাতে ও এক বার বিকালে। প্রাতের প্রস্তুত চা বেলা ৬টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত থাকে; বিকালের চা বেলা চারিটা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত থাকে। সুতরাং তিন মিনিটের স্থলে ক্রমান্বয়ে তিন শত, সাড়ে তিন শত মিনিট চা সিদ্ধ হইতে থাকে। চা গরম রাখিবার কলসীর নিম্নে একটী অনন্ত লোহার উনুন বসান থাকে। এক কলসী চাতে তিন পোয়া চিনি, ও এক পোয়া দুগ্ধ দেওয়া হয়। তীব্র করিবার জন্য আদা, মরীচ প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্য দেওয়া হয়। এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত হইয়া একটী অপূর্ব্ব পাচন প্রস্তুত হয়, এবং তাহাই সাধারণ লোকে পান করিয়া থাকে।

একেত পিতল কাঁসা প্রভৃতি পাত্রে এ সকল দ্রব্য সিদ্ধ করিলে বিষাক্ত হয়, আবার একই পাত্রে (ধৌত না করিয়া) উপর্য্যুপরি সিদ্ধ করায় ঐ সকল পাত্র যে কিরূপ বিকৃত হয় তাহা বর্ণনাতীত। আবার যে সকল ব্যক্তির দ্বারা তাহা প্রস্তুত হয়, তাহারা প্রায়ই ইতরজাতীয় এবং তাহাদের দেহ ও পরিধেয় এরূপ অপরিস্কৃত যে, দেখিলে ঘৃণার উপস্থিত হয়। ঈদৃশ অশুচি ও ঘৃণিতভাবে পাক করা চা সেবন করিয়া কত শত লোক উৎকট রোগাক্রান্ত হইতেছে তাহা কে বলিতে পারে।

যেখানে তিন মিনিট মাত্র সিদ্ধ করিবার ব্যবস্থা, সেই স্থলে এই সকল ব্যবসায়ীরা পাঁচ ছয় ঘণ্টা (পাত্র পরিবর্ত্তন বা ধৌত না করিয়া) অবিচ্ছিন্নভাবে সিদ্ধ করিয়া.

থাকে—কম পড়িলেই তদুপরি কেবল জল সেক হয়। নেশার কি মোহিনী শক্তি! লোকে কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য হইয়া অহোরাত্র অম্লান বদনে এই বিষকে পরম হিতকর বোধে উদরস্থ করিয়া থাকে।

বাবুদের বৈটকখানাতেও চার ব্যবহার কম নয়। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে চা-পান করিবার লোভে অনেক প্রতিবাসীর সমাগম হয়। পল্লীর মধ্যে মধ্যে অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন লোকের বাটীতে দুই সন্ধ্যা (Tea Party) টিপার্টির অধিষ্ঠান হয়, ও গল্পের সহিত বারংবার চা-পান ও বিস্কুট ও পাঁউরুটির টোষ্ট ভোজন হয়। ইহাদিগের মধ্যে অনেকের পিয়ালা ভরিয়া চা পানেও পিপাসার নিবৃত্তি হয় না—তাঁহারা পিয়ালা ছাড়িয়া খোরা ধরিয়াছেন—ইঁহাদের বাটীতে হাট বাজারের কদর্য্য প্রণালীতে চা প্রস্তুত না হইলেও, সিদ্ধ করিবার সময়ের বিশেষ কোন নিয়ম থাকে না। অধিক্ষণ ধরিয়া চা সিদ্ধ করায় ও অধিক মাত্রায় চা সেবন করার যে সকল দোষ, সে গুলি শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায়কেও অক্রমণ করিতেছে। ভরসা করি তাঁহারা ইংলণ্ডের সুচিকিৎসকগণের মতানুসারে ভবিষ্যতে চা ব্যবহার করিয়া দেশীয় সাধারণ জনমণ্ডলীকে সৎশিক্ষা দিবেন।

দেখিতে দেখিতে চা-পান রোগটী ম্যালেরিয়ার ন্যায় এ দেশের ইতর, ভদ্র, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিল। ইহা বড়ই দুঃখের কথা। অধিক কি, অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রাতে স্নান আহ্নিক পূজাদি ছাড়িয়া চা-পান ধরিয়াছেন। পিয়ালা, চামচে ও চা এই তিনটী, কোশা, কুশী ও গঙ্গোদকের স্থান অধিকার করিল! অধিকতর অনিষ্টের কথা, এই যে,—বয়স্ক ব্যক্তিরা চা-পান কালে আদর করিয়া অক্রবাণ শিশুগুলিকেও উহা পান করাইয়া থাকেন। ইহাতে শিশুদিগের যে কি ভয়ানক অনিষ্ট হয়, তাহা তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝেন না। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুরা জলখাবারের পয়সা লইয়া নিকটবর্ত্তী চা-পান-শালায় ছুটিতেছে। এক্ষণে কলিকাতার প্রায় প্রতি পল্লীতেই গরম গরম চা-পানের আড্ডা বসিয়াছে। বিবাহাদি উৎসবে, ক্রিয়াবাড়ীতে সর্ব্বাগ্রে চা-পানের সুব্যবস্থা হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ত্রুটী হইলে তাহা গৃহস্থের পক্ষে ক্ষমা-যোগ্য অপরাধ নহে। বাল্যকাল হইতেই যকৃতের পীড়া, মস্তিষ্ক রোগ প্রভৃতি উৎকট রোগের নিদান যে চা, চুরুট ও চূর্ণা প্রভৃতি অনিষ্টকর দ্রব্যের সেবন, ইহা আমরা বুঝিয়াও এ বিষয়ে অদ্যাপি উদাসীন আছি ইহাই আশ্চর্য্য? প্রায়ই দেখিতে পাই, শিশুরা পিতামাতা প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নানাছলে পয়সা আদায় করে। তাহারা সেই পয়সা লইয়া কি করে, সে বিষয়ে অতি অল্প কর্ত্তৃপক্ষেরই দৃষ্টি থাকে, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? শুধু বিদেশীয় দ্রব্য বর্জ্জনেই স্বদেশী ব্রত নহে,যাহাতে দেশের বালকবালিকাগণের দেহ ও মন সুস্থ ও

সমুন্নত হয়, শারীরিক ও মানসিক অনিয়ম ও অত্যাচার তিরোহিত হয়, ব্যসন ও বিলাসিতা, অপব্যয় ও অশুচিতা প্রভৃতি পরিবার হইতে অদৃশ্য হয়, এইরূপ কার্য্যই প্রকৃত স্বদেশী ব্রত।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী।

সীতা।

মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণে যে সীতা-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অতি প্রাচীন কাল হইতে কি শিক্ষিতা, কি অশিক্ষিতা, সকল শ্রেণীর সকল অবস্থার হিন্দুরমণীর জীবনের অতি উচ্চ আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। রামচন্দ্রের আদর্শ পিতৃভক্তি, অনুগত-বাৎসল্য ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠা, সীতাতে আদর্শ পতিপরায়ণতা ও সহিষ্ণুতা, লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্নে সৌভ্রাত্র এবং পবননন্দন হনুমানে আদর্শ প্রভুপরায়ণতা প্রভৃতির উজ্জ্বল হৃদয়গ্রাহী চিত্র মানবসমাজের চারিত্র-শিক্ষার অক্ষয় ও অমৃতময় আদর্শ। প্রত্যেক হিন্দুপরিবারের পুরুষ ও স্ত্রী, বালক ও বালিকা রামায়ণের এই চরিতাবলি আদর ও ভক্তির সহিত আপনাদিগের আদর্শ-রূপে হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিয়াছে। অতি শৈশব কাল হইতে হিন্দু বালিকা "সীতার মত সতী হই" "রামের মত স্বামী পাই," "লক্ষণের মত দেবর পাই" এইরূপ প্রার্থনা করিতে শিক্ষা করে। বস্তুতঃ যতদিন এইরূপ চরিত্র হিন্দু গৃহের আদর্শ হইয়া থাকিবে ততদিন হিন্দুসমাজ ধর্ম্ম-সমাজ ও হিন্দু গৃহ ধর্ম্মক্ষেত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যাবতীয় সুসভ্যদেশে আদৃত হইবে।

মহাকবি সীতাচরিত্রে যে সকল অত্যুৎ-কৃষ্ট গুণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন তন্মধ্যে পতিভক্তি ও সহিষ্ণুতা সর্ব্বপ্রধান। সীতাতে এই দুই গুণের যেরূপ পরাকাষ্ঠা দেখা যায় আর কোথাও তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। আধুনিক নাটকাদিতে পতির প্রতি পত্নীর অনুরাগের যে সাময়িক উচ্ছ্বাস দৃষ্ট হয় সীতাতে ঠিক তাহা না থাকিলেও সীতাচরিত্র হিন্দুরমণীর জীবন গঠনে যাহা করিয়াছে ও করিতেছে আর কিছুতে তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম যখন চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস শিরোধার্য্য করিয়া বনগমনের উদ্যোগ করিলেন, সীতাও তাঁহার অনুগামিনী হইতে কৃতসঙ্কল্পা হই-লেন। কি গুরুজন, কি সমবয়স্ক, সকলেই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাম নিজেও তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে বিস্তর অনুরোধ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু চতুর্দ্দশ বৎসর পতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইল। এতাধিক দীর্ঘকাল পতির অদর্শন অপেক্ষা পতির সহিত অরণ্যবাস তাঁহার শ্রেয় বোধ হইল। পতি বনবাসের কষ্টভোগ করিবেন, আর তিনি রাজপ্রাসাদে রাজ-

ভোগে সুখে অবস্থিতি করিবেন, প্রতিব্রতা স্বাধ্বীর প্রাণ ইহা অনুমোদন করিতে পারিল না। কোন অনুরোধে ও কোন নিষেধে তিনি তাঁহার সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি জটাধারণ ও বল্কল পরিধান করিয়া পতির সহিত বনবাসিনী হইয়া আপনাকে পরম সুখী ও সৌভাগ্যবতী মনে করিলেন। পতিসহবাসে বনগমন ও বনবাসের কষ্ট তাঁহার পক্ষে সুখের কারণরূপে পরিণত হইল। রাক্ষস ও হিংস্রজন্তুপূর্ণ এবং নানা বিপদসঙ্কুল মহারণ্য মধ্যে বাস করিয়াও পতিসহবাসে তিনি পরম সুখে কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এমন কি যখন রাবণ ছদ্মবেশে তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, অপরিচিত স্থানে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাঁহাকে কত নিগ্রহ, কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তথাপি বনবাসে পতির অনুগামিনী হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও অনুতপ্তা হন নাই।

সীতা চরিত্রের অপর আদর্শগুণ সহিষ্ণুতা। ইহা দ্বারা তাঁহার পতিপরায়ণতা উদ্ভাসিত হইয়াছে। একদিকে যেমন তাঁহার আদর্শ পতিভক্তি অপর দিকে তেমনি তাঁহার আদর্শ সহিষ্ণুতা। কেবল যে, সীতা অম্লান বদনে বনবাসের কষ্ট ও লঙ্কায় রাক্ষসগৃহে বাসের কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার সহিষ্ণুতা, তাহা নহে, তাঁহার সমগ্র জীবনই সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লঙ্কায় রাক্ষসগৃহে তাঁহাকে একাকিনী বাস করিতে হইয়াছিল, এই জন্য রাবণবধের পর যখন তাঁহার উদ্ধার সাধন হয় তখন রাম তাঁহাকে লোকাপবাদ হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নি পরীক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন। রাম তাঁহার চরিত্র ও পতিপরায়ণতায় বিশেষ অভিজ্ঞ হইয়াও তাঁহার এই কঠোর পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন, এই মনে করিয়া সীতা ক্ষুব্ধা ও ব্যথিতা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রামের মর্য্যাদা রক্ষা ও মঙ্গলের জন্য তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। এবং তজ্জন্য তিনি কখন রামকে অনুযোগ করেন নাই। যে রাম তাঁহার জীবন সর্ব্বস্ব, যাঁহার জন্য তিনি সমস্ত সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া বনচারিণী হইলেন, যাঁহার জন্য তাঁহার রাক্ষসগৃহে বাস, সেই রামই তাঁহাকে এইরূপে লাঞ্ছিত করিলেন, সীতা তাহাও সহ্য করিলেন। আবার যখন রাম অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন প্রজাদিগের মধ্যে কেহ কেহ রাবণ গৃহে একাকিনী বাস করিবার জন্য সীতার নির্ম্মল চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হয়। তাহাতে রাম স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে পাছে ত্রুটি হয়, এই আশঙ্কায়, তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ জানিয়াও গর্ভাবস্থাতেই তাঁহাকে জন্মের মত বনবাস দিলেন। অভাগিনী সীতা তাহাও সহ্য করিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রাণে যে কি দারুণ ক্লেশ হইয়াছিল তাহা অনুভব করা যাইতে পারে কিন্তু বাক্যে বলিয়া বা লেখনী দ্বারা লিখিয়া

প্রকাশ করা যায় না। তবুও তিনি কখনও ইহার জন্য রামের নিন্দা বা গ্লানি করেন নাই। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন রামের ধ্যান, রামের কল্যাণ কামনায় ও রামের গুণকীর্ত্তনে তিনি পরমানন্দ লাভ করিতেন। তাঁহার এই বনবাস ও তাহার প্রতি রামের এতাধিক নির্দ্দয় আচরণের জন্য কেবল আপনার দুরাদৃষ্টের দোষারোপ করিতেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার পতিভক্তি কখনও ম্লান হয় নাই। হৃদয়পটে পতিপরায়ণতার উজ্জ্বল চিত্র লইয়া তিনি ইহলোক হইতে বিদায় হন। মহাকবি সীতা-চরিত্রে যে অলৌকিক সহিষ্ণুতার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাও হিন্দু নারীকুলের অত্যুচ্চ আদর্শ। রাজনন্দিনী ও রাজবধু হইয়া সীতা অকাতরে রাজপ্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া পর্ণকুটীরবাসিনী হইলেন। রাজ-বসন ভূষণ ছাড়িয়া বল্কলধারিণী হইয়া রাজভোগের পরিবর্ত্তে ফলমূলহারিণী হইলেন; কণ্টকাকীর্ণ বনে পতিসহ-চারিণী হইয়া, রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইলেন; রাক্ষসপরিবেষ্টিত হইয়া অশোক বনে কত নিগ্রহ ও কত লাঞ্ছনা সহ্য করিলেন, তথাপি তাঁহার পতিভক্তি ও সহিষ্ণুতা অক্ষুন্ন রহিল, কিছুতেই তাহার তিল মাত্র ব্যত্যয় হইল না। যে পতির সহচারিণী হইবার জন্য তিনি সুখ সৌভাগ্যে জলাঞ্জলি দিলেন, যে পতি তাঁহার জীবনের একমাত্র আরাধ্য দেবতা ছিলেন, যে পতির পদসেবা তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, সেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পতি তাঁহাকে বিনা দোষে অসহায় অবস্থায় বনবাস দিয়া জন্মের মত পরিত্যাগ করি-লেন। তথাপি সীতার সহিষ্ণুহৃদয় বিচ-লিত হইল না। তিনি বাল্মিকির তপো-বনে আশ্রয় লইয়া প্রসন্নচিত্তে পুত্রদ্বয়ের-লালন পালন ও শিক্ষা দানে রত হইয়া চরিত্রের মাধুর্য্যে ও সহিষ্ণুতার পরা-কাষ্ঠায় সকলকেই মোহিত করিয়াছিলেন। এই সহিষ্ণুতার আদর্শে হিন্দুগৃহের কত জননী, কত ভার্য্যা, কত কন্যা, কত আত্মীয়া, এই দুঃখময় সংসারকে সুখময় স্বর্গে পরিণত করিয়াছেন ও করিতেছেন।

মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্তের পরলোক গমনে *।

আমাদের দেশের পুরুষসিংহ, স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত পরলোক গমন করিয়াছেন। দেশ ও বিদেশে শত শত অক্ষয় কীর্ত্তি আজ তাঁহার অমরত্ব ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা ছাড়িয়া দিলেও তিনি যে আমাদের দেশের কি প্রকার উচ্চ আদর্শ-স্বরূপ ছিলেন, আজ তাহারই

* মজিলপুর জয়নগর হিতৈষিণী-সভায় ১৩১৪ সাল ১৫ ভাদ্র শ্রীকেশবচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক পঠিত।

সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবার আমার ইচ্ছা আছে। পুণ্যশ্লোক উমেশচন্দ্র যে আমাদের দেশের কিরূপ হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাহা ভাষা দ্বারা কিম্বা বক্তৃতা করিয়া প্রকাশ করা যায় না; এবং সেই অসামান্য প্রতিভাশালী, সর্ব্বগুণসম্পন্ন স্বর্গগত উমেশচন্দ্রের অতুলনীয় গুণরাশি বর্ণনা করা কোন ক্রমেই আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নহে। প্রকৃত গুণগ্রাহী ব্যক্তি ভিন্ন বোধ হয় কেহই সেই নির্ম্মল, নিষ্কাম এবং সংসার জীবনের উচ্চতম আদর্শ ব্যক্তিকে বুঝিতে পারিবেন না।

আমার প্রথম কথা—এই যে, হিতৈষিণী সভা, যাহার নাম বিস্মৃতির অতল জলে নিমজ্জিত হইয়াছিল, এবং কিছুদিন পূর্ব্বে যাহার অস্তিত্ব এক সময়ে ছিল বলিয়া কেহই ধারণা করিতে পারিতেন না, সেই বিলুপ্তপ্রায় হিতৈষিণী সভাকে উমেশচন্দ্র নিজের অদম্য উৎসাহে, অযাচিত পরিশ্রমে, এবং অকৃত্রিম স্বদেশভক্তির গুণে পুনরুজ্জীবিত করিয়া দেশের ও দশের সমক্ষে যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। এবং সেই হিতৈষিণী সভা হইতে বিগত ১৩১৩ সালের চৈত্র মাসে তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বার্দ্ধক্য ও রুগ্ন অবস্থাকে তুচ্ছ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমপূর্ব্বক, যে স্বদেশী কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিয়া আমাদিগকে ও আমাদের জন্মভূমিকে যেরূপ গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, নিশ্চয়ই তাঁহার সে অক্ষয়কীর্ত্তি মজিলপুরের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। যাহা কোনও দেশের পল্লী সভা সমিতিতে কখনও হয় নাই, উমেশচন্দ্র অসাধ্য সাধন করিয়া আমাদের দেশে তাহাই করিয়া গিয়াছেন। ইহা কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবে?

আমার দ্বিতীয় কথা—যখন দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পতিত হইয়া, দেশের অনাথ ও দীনহীনগণ প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল, অন্নাভাবে যখন তাহাদের কণ্ঠাগত প্রাণ, তাহা দেখিয়া আমাদের স্বদেশপ্রাণ, পরদুঃখকাতর উমেশচন্দ্রের সরল প্রাণে শেলসম বাজিয়াছিল, তাই তিনি অযাচিত এবং নিঃস্বার্থভাবে দেশ বিদেশে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া সেই সমস্ত মৃতকল্প ব্যক্তির জন্য অন্নসংস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারই যত্নে এই হিতৈষিণী সভা হইতে প্রত্যহ প্রায় তিন শত অনাথ ব্যক্তি আহার পাইয়া জীবন-ধারণ করিয়াছিল। এরূপ মহৎ দৃষ্টান্ত বোধ হয় মজিলপুরের জীবনে কখন ঘটে নাই, এবং ঘটিবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু আজ আমরা সেই জ্ঞানবৃদ্ধ মহাপুরুষকে জন্মের মত হারাইয়াছি। আজ হিতৈষিণী সভার সর্ব্বস্ব গিয়াছে। আজ হিতৈষিণী সভার সর্ব্বনাশ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; আজ আমাদের বড়ই শোকের দিন? যে অমূল্য রত্ন মজিলপুরের ক্রোড় হইতে চিরবিসর্জ্জিত

হইয়াছে, বোধ হয় শত সহস্র বর্ষ আমাদের অসাধ্য সাধনাতেও আর তাহা মিলিবে না। আর উমেশচন্দ্রের স্থায় প্রকৃত স্বদেশভক্তকে আমরা পাইব না। তাই আমি বলিতেছিলাম উমেশচন্দ্র যে আমাদের দেশের কিরূপ হিতৈষী ছিলেন তাহা ভাষায় কিম্বা বক্তৃতায় প্রকাশ করা যায় না।

তাঁহার জীবদ্দশায় আমরা বুঝিতে পারি নাই, বা বুঝিবার চেষ্টাও করি নাই, যে, তিনি আমাদের মধ্যে কিরূপ ভাবে অবস্থান করিতেন, তাই আজ তাঁহাকে হারাইয়া পদে পদে তাঁহার অভাব অনুভব করিতেছি। কিন্তু এই অভাবকে আমাদের আশ্রয় করিতে হইবে; এই অভাবের দিকে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের সকলকেই সেই মৃত মহাত্মার অসমাপ্ত প্রত্যেক কার্য্যের অনুসরণ করিতে হইবে, ইহা একপ্রকার সেই মহাপুরুষের বাক্যের প্রতিধ্বনি মাত্র।

আমরা এই শোকসভায় সম্মিলিত হইবার বহুপূর্ব্বে যে দিন বারাশতে ২৪ পরগণায় (District Conference) বা জেলা সমিতির প্রথম অধিবেশন দিবসে পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য যখন সেই সমিতির অসংখ্য সভ্য ও দর্শকবৃন্দ অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেই সময় এই হতভাগ্য দেশের সর্ব্বজন সম্মানিত প্রিয়তম পুত্র পরলোকগত উমেশচন্দ্রের নাম সেই মহাসভাতে উপস্থিত হইয়াছিল। সকলেই তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু হে আদর্শ-চরিত্র মহাপুরুষ! হে সংসার-আশ্রমে মহাযোগী! আমরা সেরূপ-কল্পিত শোক দ্বারা বাহ্য জগৎকে মুগ্ধ করিবার বাসনা করি নাই। তোমার মহাপ্রস্থানে আমাদের জীবন যেরূপ ঘোর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে—হৃদয়ে যেরূপ ভীষণ শোকের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, তাহা ভাষাদ্বারা কিম্বা কল্পনা করিয়া ব্যক্ত করা এখন পর্য্যন্তও আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। গভীর শোকার্ত্ত ব্যক্তি যেমন দরবিগলিত-নেত্রে কেবল অশ্রুবর্ষণ করিয়া থাকে, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে পারে না, আমাদের অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছে। কিন্তু হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশনায়ক! হে পুণ্য-প্রাণ স্বদেশভক্ত! আমরা অকৃতজ্ঞ হইলেও তোমাকে ভুলিব না। যে মহান্ আদর্শের সমুজ্জ্বল-রেখা আমাদের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া গিয়াছ—নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশের প্রতি যে ভালবাসা দেখাইয়া গিয়াছ, তাহা কখনও ভুলিবার নহে। তোমার গুণরাশি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমাদের হৃদয়ে জ্বলন্ত অক্ষরে খোদিত থাকিবে। শোকসভা করিয়া আমরা তোমার প্রতি কতটুকু সম্মান দেখাইতে পারিব? তুমি আমাদের হৃদয়ের বস্তু, তুমি আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। তোমার প্রদত্ত মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া যদি আমরা তোমার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে

পারি, তাহা হইলেই আমরা কৃতার্থ হইব এবং তাহা হইলেই তোমার সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এবং তাহা হইলেই আমরা তোমার শুভাশীষ লাভে সমর্থ হইব।

জীবনের শেষ সীমায় জরাজীর্ণ অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াও উমেশচন্দ্র দেশের ও দশের জন্য যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, আমরা সবল ও সুস্থ দেহে তাহার এক কণা মাত্রও করিতে পারিতেছি না—কিম্বা সেরূপ করিবার আশাও আমাদিগের মধ্যে নাই। এই হিতৈষিণী সভার প্রথম উত্থানের সূত্রপাতেই আমরা যেরূপ গুরুতর বাধা প্রাপ্ত হইয়াছি, বলিতে পারি না ইহার সীমা এই পর্য্যন্ত শেষ কি না। এই সভা সংক্রান্ত সমস্ত বিভাগেই এখন আমাদের অভাব, একটীও এখন সম্যক পরিস্ফুট হয় নাই, এই সময় যদি আমরা সকলে সম্মিলিত চেষ্টা দ্বারা ইহার উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান্ না হই, যাহার যতটুকু পরিমাণ সামর্থ্য আছে তাহা যদি ইহার জন্য যোজিত না করি, যদি প্রথম বিকসিত অবস্থাতেই আমাদের জীবন-প্রিয় জন্মভূমির হিতৈষিণী সভা পুনরায় বিশুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের আর জনসমাজে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় না দেওয়াই ভাল। এক মাত্র সেই জ্ঞানবৃদ্ধের অভাবে যদি আমরা সকলে সমবেত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহ সহকারে তাঁহার কর্ম্মের অনুসরণে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলেও তাঁহার প্রতি আমাদের কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইবে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত হিতৈষিণী সভাকে যদি আমরা পুনরায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারি, তাহা হইলে স্বর্গ হইতে তিনি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, এ কথা স্থির এবং নিশ্চয়।

যাও কর্ম্মবীর! মনুষ্যলোকে তোমার কার্য্যের শেষ হইয়াছে, তাই তুমি অমরধামে চলিয়া গিয়াছ, যাও ধর্ম্মপ্রাণ মহাভাগ! তোমার জন্য স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত। যথায় স্বদেশসেবী মহাত্মাদিগের জন্য পবিত্র আশ্রম নির্ম্মিত আছে, তুমি অনন্ত অনন্ত কাল সেই পুণ্যময় ধামে বাস কর। তোমার বামাবোধিনী তোমার বিজয়স্তম্ভ। যতদিন দেশে বঙ্গসাহিত্যের সমাদর থাকিবে, ততদিন তুমি অমর হইয়া প্রত্যেক শিক্ষিত বঙ্গনরনারীর হৃদয়ে স্থান পাইবে। তোমার স্মৃতি আমরা কি দিয়া রক্ষা করিব? আমাদের কিছুই সম্বল নাই। তোমার কীর্ত্তি তুমিই অর্জ্জন করিয়া গিয়াছ। দেশ বিদেশে তোমার যে সমস্ত মহত্বের চিহ্ন আছে, তাহাই চিরকাল তোমার অমরত্ব ঘোষণা করিবে। যাও দেব! তুমি স্বর্গের বস্তু, স্বর্গে যাও, যদি কখনও আমাদিগের পথভ্রান্তি ঘটে, তুমি স্বর্গ হইতে স্নেহনেত্রে আমাদিগকে সৎপথ দেখাইয়া দিও।

শ্বেতকেতুর উপাখ্যান।

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে গৃহীত)

শ্বেতকেতু নামে এক ঋষিকুমার ছিল। তাহাকে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া তাহার পিতা তাহাকে গুরুকুলে বেদাধ্যয়ন জন্য প্রেরণ করিলেন। শ্বেতকেতু দ্বাদশবর্ষ হইতে চতুর্বিংশবর্ষ পর্য্যন্ত গুরুর নিকট সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যামদে অভিমানী, বেদজ্ঞ অহঙ্কৃতস্বভাব হইয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পিতা তাহার স্বভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় নাই, কেবল বেদার্থজ্ঞান মাত্র সার হইয়াছে। তিনি পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্বেতকেতু! দেখিতেছি তোমার বড় পাণ্ডিত্যাভিমান হইয়াছে এবং তুমি বড় অহঙ্কৃতস্বভাব হইয়াছ, বল দেখি তুমি সেই তত্ত্ব কিছু জানিয়াছ কিনা, যদ্দ্বারা অশ্রুত বস্তু শ্রুত হয়, মননের অবিষয় বস্তু মননের বিষয় হয়; অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়। তোমার গুরু এবিষয় তোমাকে কি শিক্ষা দিয়াছেন?

শ্বেতকেতু উত্তর দিল, ভগবন্! সে বিষয় কি?

পিতা বলিলেন, শ্রবণ কর। সৌম্য! যেমন একটী মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান হইলে সমস্ত মৃণ্ময় বস্তুর জ্ঞান হয়, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ বিশিষ্ট মৃণ্ময় বস্তু সকল স্বরূপতঃ কেবল মৃত্তিকা মাত্র, যেমন একখণ্ড সুবর্ণ জানিলে সুবর্ণ নির্ম্মিত সমস্ত পদার্থই জানা হইল, সকলই নাম রূপ ভেদ মাত্র, কিন্তু স্বরূপতঃ সকলই সুবর্ণ; যেমন একটী নখনিকৃন্তন (নরুন) অথবা লৌহপিণ্ড জানিলে লৌহনির্ম্মিত সমস্ত বস্তুই জানা যায়, সকলই নামরূপ ভেদ মাত্র, স্বরূপতঃ সকলই লৌহ; যে তত্ত্বের বিষয় আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাহাও সেইরূপ।

শ্বেতকেতু বলিল, আমার গুরু এই তত্ত্ব নিশ্চয়ই জ্ঞাত নহেন, নতুবা আমাকে তদ্বিষয়ে অবশ্যই শিক্ষা দিতেন। ভগবন্! আপনি আমাকে তাহা বলুন। পিতা বলিলেন, সৌম্য! শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে এই জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল এক অদ্বিতীয় সত্য পুরুষ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বে কেবল এক অদ্বিতীয় অসত্য ছিল এবং সেই অসত্য হইতে অর্থাৎ অসদবস্থা হইতে এই সদবস্থা হইয়াছে।

কিন্তু হে সৌম্য! তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? অসত্য হইতে সত্য কি প্রকারে উৎপন্ন হইবে? হে সৌম্য! পূর্ব্বে কেবল এক সত্য ছিলেন, দ্বিতীয় বস্তু ছিল না।

এই সত্যস্বরূপ পরমাত্মা সকলের প্রাণ, ইনি সত্য, ইনি আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিও তাহা হইতে!

শ্বেত। হে ভগবন্! আমাকে আরও বিস্তারিতরূপে উপদেশ করুন।

পিতা। শ্রবণ কর। যেমন মধুকর মধুক্রম করিবার জন্য নানা স্থানের নানা বৃক্ষ হইতে রস সংগ্রহ করত তাহাদিগকে এক

মধু আকার প্রদান করে; ঐ রসসকল জানেনা যে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন পুষ্পের রস। সেইরূপ প্রাণী সকল মৃত্যুর পর যখন সত্যকে প্রাপ্ত হয় তখন তাহারা জানেনা যে তাহারা ব্যাঘ্র ছিল, কি সিংহ ছিল, কি বৃক ছিল, কি বরাহ ছিল, কি কীট ছিল, কি পতঙ্গ ছিল, কি দংশ ছিল, কি মশক ছিল।

সেই যে সূক্ষ্ম বস্তু যিনি সকলের আত্মা- তিনি সত্য, তিনি আত্মা। হে শ্বেত- কেতো! তুমিও তাহা হইতে।

শ্বেত। ভগবন্! আরও আমায় উপদেশ করুন।

পিতা। শ্রবণ কর।

হে সৌম্য! এই সমস্ত নদী পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইয়া সমুদ্রে মিলিত হয় এবং যে সমুদ্র হইতে তাহারা উৎপন্ন হইয়াছিল সেই সমুদ্রই হইয়া যায়; এবং তখন আর ইহা আমি ইহা আমি এরূপ জ্ঞান থাকে না।

সেইরূপ এই সমস্ত প্রজা সত্য হইতে উৎপন্ন হইয়া জানে না যে সত্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা জানে না যে আমি ব্যাঘ্র, আমি সিংহ, আমি বৃক, আমি বরাহ, আমি কীট, আমি পতঙ্গ, আমি দংশ আমি মশক।

সেই সূক্ষ্ম বস্তু যাহা সকলের আত্মা তাহাই সত্য, তাহা সর্ব্বাত্মা। হে শ্বেত- কেতো! তুমিও তাহা।

শ্বেত। ভগবন্ পুনর্ব্বার আমাকে উপদেশ করুন।

পিতা। সৌম্য! শ্রবণ কর। হে সৌম্য! ঐ মহাবৃক্ষের মূলে যদি কেহ আঘাত করে তাহা হইতে রস স্রবণ হয়, উহার মধ্য দেশে আঘাত করিলে তাহা হইতে রস স্রবণ হয়, উহার উপরিস্থ শাখাতে আঘাত করিলেও রস স্রবণ হয়। উহার সর্ব্বাঙ্গে জীবন আছে বলিয়া পৃথিবী হইতে রসাকর্ষণ করত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কিন্তু যখন উহার একটী শাখা হইতে জীবন চলিয়া যায় ঐ শাখা শুষ্ক হয়, দ্বিতীয় শাখা হইতে জীবন চলিয়া গেলে তাহা শুষ্ক হয়। যখন সমস্ত বৃক্ষ হইতে জীবন চলিয়া যায়, সমস্ত বৃক্ষ শুষ্ক হয়।

সেইরূপ জানিবে,—যখন জীবন এই শরীরকে পরিত্যাগ করে, তখন এই শরীর মৃত হয়, কিন্তু সেই জীবন কখন নষ্ট হয় না। সেই সূক্ষ্ম বস্তু যাহা এই শরীরের আত্মা তাহাই সত্য, তাহা সকলের আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিও তাহা।

শ্বেত। ভগবন্ আমাকে আরও উপদেশ করুন।

পিতা। সৌম্য! শ্রবণ কর।

ন্যগ্রোধ বৃক্ষের ফল আনয়ন কর। শ্বেত। "এই আনিয়াছি।" পিতা। "উহাকে ভগ্ন কর।" শ্বেত। "করিয়াছি।"

পিতা। "উহার মধ্যে কি দেখিতেছ"। শ্বেত। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ দেখি- তেছি।" পিতা। উহার একটী বীজকে ভগ্ন কর। শ্বেত। ভগ্ন করিয়াছি। পিতা। কি দেখিতেছ? শ্বেত। ভগবন্! কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।

পিতা। সৌম্য! তুমি কিছুই দেখিতে পাইতেছ না, কিন্তু উহার মধ্যে অদৃষ্টভাব একটী মহান্ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ আছে।

হে সৌম্য! অনুধাবন কর, সেই সূক্ষ্মবস্তু যিনি সকলের আত্মা তিনিই সত্য, তিনি সর্ব্বাত্মা, হে শ্বেতকেতো! তুমিও তাহা।

শ্বেত। ভগবন্! সেই সত্য হইতে উৎপন্ন এই জগৎ নিত্য হয় না কেন? আমাকে উপদেশ করুন। পিতা। সৌম্য! শ্রবণ কর।

এই লবণ এই জলে প্রক্ষেপ কর এবং কল্য প্রাতঃকালে আমার নিকট আসিও আমি তোমাকে উপদেশ করিব। শ্বেতকেতু পাত্রস্থিত জলে লবণ নিক্ষেপ করিয়া শয়ন করিতে গেল। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করত পিতৃসমীপে সমুপস্থিত হইলে পর পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কল্য এই জলে যে লবণ নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তাহা কোথায় দেখিতে পাইতেছ? লবণ জলে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে সুতরাং শ্বেতকেতু তাহা দেখিতে পাইল না। তাহার পিতা তাহাকে বলিলেন, ঐ জলের উপর হইতে একবিন্দু লইয়া আস্বাদন কর। শ্বেতকেতু আস্বাদন করিল তদনন্তর তাহার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, জলের কিরূপ স্বাদ? শ্বেতকেতু উত্তর করিল লবণাক্ত। মধ্য হইতে এক বিন্দু জল লইয়া আস্বাদ কর। শ্বেতকেতু তাহা করিলে পর পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহার কিরূপ আস্বাদ? শ্বেতকেতু বলিল—লবণাক্ত। তদনন্তর নিম্ন হইতে একবিন্দু জল আস্বাদন করিতে বলিলেন; শ্বেতকেতু তাহা করিল এবং পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিল এ জলও লবণাক্ত। তদনন্তর তাহার পিতা ঐ জল নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, তুমি মুখপ্রক্ষালন করিয়া আইস। শ্বেতকেতু প্রত্যাগমন করিয়া তাহার পিতাকে বলিলেন, আমি ঐ জলে যে লবণ নিক্ষেপ করিয়াছিলাম তাহা আছে। যদিও আমি তাহা চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইতেছি না, রসনা দ্বারা অনুভব করিলাম। তাহা শ্রবণ করিয়া তাহার পিতা তাহাকে বলিলেন, সত্য সম্বন্ধে ও এইরূপ নিশ্চয় জানিবে। যদিও তাহা দৃষ্ট হয় না, কিন্তু উহা আমাদের সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

হে সৌম্য! সেই সূক্ষ্মবস্তু যাহা সকলের আত্মা তাহাই সত্য তাহা সর্ব্বাত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিও তাহা।

শ্বেতকেতু বলিল—জলমিশ্রিত লবণ যেমন অদৃষ্ট হইয়াও রসনা কর্তৃক অনুভূত হইল, সেইরূপ এই আত্মা বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর না হইয়াও মন দ্বারা কিরূপে উপলব্ধ হন? ইহা না জানিয়া আমি অসুখী আছি এবং জানিলে সুখী হইব, অতএব ইহা জানিবার উপায় আমাকে বলিয়া দিন। পিতা বলিলেন—শ্রবণ কর।

হে সৌম্য! যেমন কোন ব্যক্তিকে গান্ধার দেশ হইতে বদ্ধাক্ষ করিয়া কোন দূরস্থ বিজন স্থানে লইয়া ছাড়িয়া দিলে সে পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করত আমাকে বদ্ধাক্ষ করিয়া আনিয়া

একাকী রাখিয়া গিয়াছে বলিয়া রোদন করিতে থাকে, এবং কোন দয়ার্দ্রচিত্ত ব্যক্তি তাহার চক্ষুর বন্ধন উন্মোচন করিয়া গান্ধারের পথ দেখাইয়া দিলে সে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পরিশেষে গান্ধার দেশে উপনীত হয়, তদ্রূপ উপযুক্ত আচার্য্যবান, ব্যক্তি স্বীয় পথ অবগত হইয়া সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করে।

হে সৌম্য! সেই সূক্ষ্ম বস্তু যাহা সকলের আত্মা, তাহাই সত্য তাহাই সর্ব্বাত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিও তাহা। শ্বেত। হে ভগবন্! কিরূপে সেই মোক্ষ লাভ হয়, আমাকে আরও দৃষ্টান্ত দিয়া উপদেশ করুন। পিতা। হে সৌম্য! শ্রবণ কর।

যেমন কোন ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন হইলে যখন তাহার আত্মীয়গণ তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া জিজ্ঞাসা করে— আমাকে চিনিতে পার? আমাকে চিনিতে পার? যতক্ষণ না তাহার বাক্য মনেতে, মন প্রাণেতে, প্রাণ তেজেতে এবং তেজ পরম দেবতাতে সম্পন্ন হয়, ততক্ষণ সে সকলকে চিনিতে পারে, কিন্তু তাহার পর আর পারে না।

সেই সূক্ষ্ম বস্তু যাহা সকলের আত্মা, তাহা সত্য, তাহা সকলের আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিও তাহা।

শ্বেত। হে ভগবন্! অজ্ঞান ব্যক্তি কেন সংসারগতিকে প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞ মুক্তিলাভ করে, ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাকে উপদেশ করুন; যদিও উভয়েই সত্যকে লাভ করে এরূপ বোধ হয়। পিতা। সৌম্য! বলিতেছি শ্রবণ কর।

যখন কোন চৌর্য্যাপরাধী ব্যক্তি বদ্ধ-হস্তে আনীত হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, যদি সে অস্বীকার করে এবং বিচারপতি তপ্তলৌহ দ্বারা তাহাকে পরীক্ষা করিবার আদেশ করেন, সে যদি অসত্য দ্বারা আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে, সেই অসত্যাশ্রয়ী আপনার আত্মাকে অসত্যে আবৃত করায় সেই তপ্তলৌহ তাহাকে দগ্ধ করে, কিন্তু সে যদি চোর না হয় এবং সত্যদ্বারা আপ-নাকে রক্ষা করে, সেই সত্যাশ্রয়ী দগ্ধ হয় না এবং তখন বন্ধন মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

সেইরূপ সত্য সত্যবানের আত্মাকে রক্ষা করে। সকলই সেই সত্যাত্মা, হে শ্বেতকেতো! তুমিও তাহা।

খুল্লনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঘোর বিপন্ন অবস্থায় সদাগর সিংহলের কালীদহ নামক দহে উপস্থিত হইয়া যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিলেন তাহাই তাঁহার সর্ব্বনাশের মূলীভূত হইল। দেবী ভগবতী

সদাগরকে ছলনা করিবার জন্য এই দৃশ্য রচনা করিয়াছিলেন। সদাগর দেখিলেন অনন্ত নীলাম্বুরাশি। তাহাতে শ্বেত পীত লোহিতাদি নানা বর্ণের কমল বিকশিত। মধ্যে হংস হংসীর সহিত কেলী করিয়া বেড়াইতেছে। সেই কমলবন মধ্যে এক অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী কামিনী কুঞ্জর কোলে লইয়া এক এক বার তাহাকে গিলিয়া ফেলিতেছেন, আবার তৎক্ষণাৎ তাহাকে উদ্গীর্ণ করিতেছেন। এই অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দর্শন করিয়া ধনপতি হতবুদ্ধিপ্রায় ও স্তম্ভিত হইলেন। নাবিকগণকে তাহা দেখাইতে লাগিলেন। তাহাদের কেহ কিছুই দেখিতে না পাইয়া সাক্ষী হইতে স্বীকার করিল না। সদাগরের একান্ত ইচ্ছা তিনি সিংহলের রাজার নিকট কমলে কামিনী দর্শনের বিষয় বিবৃত করেন। নাবিকগণ স্বীকার করিল না। তথাপি তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। ক্রমে সদাগরের মধুকর নামক জাহাজ সিংহলের রত্নমালার ঘাটে উপনীত হইল। সেকালের রীতি অনুসারে ঘাটে দগড়া দামামা থাকিত, কূলে উঠিয়া সদাগর দামামা ধ্বনি করিলেন। হঠাৎ এই শব্দে সভাসদ্ সহিত সিংহলেশ্বর রাজা শালবান্ চমকিত হইয়া কোটালকে উঠিয়া ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, "কে কোথা হইতে কখন আইসে তাহার সংবাদ রাখিস্ না—শীঘ্র গিয়া দেখিয়া আয়।"

কোটাল রত্নমালার ঘাটে আসিয়া সদাগরকে দেখিয়া অকস্মাৎ তিনি কেন দামামা ধ্বনি করিলেন জিজ্ঞাসায় সদাগর কেবলমাত্র বলিলেন, বাণিজ্যার্থ তাঁহার আগমন। বাণিজ্য করিয়া চলিয়া যাইবেন।

কোটাল তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া বলিল—যদি দেশে চোর ডাকাইত আইসে আমি তজ্জন্য দায়ী, অতএব তুমি যে আসিয়াছ তুমি সাধু কি চোর কেমনে জানিব? আমার দায়িত্বের জন্য আমার পঞ্চাশ কাহন কড়ি প্রাপ্য তাহা দিতে হইবে।

ধনপতি সহজে ক্ষান্ত হইবার লোক নহেন, তিনি কূলে উঠিয়া রাজ দরবারে যাত্রা করিলেন। তথায় রাজার দ্বারা সংকৃত হইয়া সভায় উপবিষ্ট হইলে কথা প্রসঙ্গে কমলে কামিনী দর্শনের কথা তুলিলেন, এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবার জন্য রাজার কৌতূহল জন্মিল—কিন্তু ইহা নিতান্ত অসম্ভব—সভাস্থ সকলে সদাগরকে পাগল বলিয়া উপেক্ষা করিলে সদাগর বলিলেন—"যদি সত্য না হয়, আমার ধনসম্পত্তি হারিব আর দ্বাদশ বৎসর কারাবদ্ধ থাকিব।

রাজাও প্রতিজ্ঞা করিলেন, সত্য হইলে অৰ্দ্ধেক রাজত্ব দান করিবেন। উভয় পক্ষের প্রতিজ্ঞা পত্র লিখিত হইল। সকলেই সভা ত্যাগ করিয়া কালীদহে উপস্থিত হইলেন। যাঁহার মায়ায় এই বিশ্বসংসার চলিতেছে,—পরকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে আমার পুত্র, আমার কন্যা বলিয়া মানব বিষম ভ্রমে পতিত হইয়া আছে—

সংসারের মোহ গর্ত্ত হইতে উঠিতে পারিতেছে না। মহামায়ার ছলনা কালীদহে কমলে কামিনী—সদাগরের সাধ্য কি যে সেই ছলনার মধ্যে প্রবিষ্ট হন বা তাহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়া উঠেন। সকলে কালীদহে উপস্থিত হইলে—কোথায় বা কমলে কামিনী, কোথয় বা তাঁহার গজগ্রাস, কোথায়ই বা তাহার পুনরুদ্গিরণ! সদাগর সকলের নিকট বেকুব প্রতিপন্ন হইয়া কারারুদ্ধ হইলেন, তাঁহার মধুকর নামে অর্ণবপোত ও তাহাতে যাহা কিছু ছিল সমস্তই রাজ সরকারে জব্দ হইল।

এখানে উজানীতে খুল্লনা পূর্ণগর্ভা হইয়া উঠিলেন। যথাকালে তিনি একটী পুত্র প্রসব করিলেন। বিহিত বিধানে নবজাত শিশুর জন্মোৎসব হইল। দৈবজ্ঞে গণনা করিয়া দেখিলেন—জাতক পরম সৌভাগ্যবান্ কৃতী পুরুষ হইবে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল, বণিক্‌পুত্রের নামকরণ, অন্নাশনাদি উৎসব সমাধা হইল—চারি বৎসর চারি দিনে বিদ্যারম্ভ হইল—বিদ্যা শিক্ষায় শ্রীমন্ত অসাধারণ ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন করিতে লাগিল, অল্পদিন মধ্যেই সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, কোষ অভ্যাস করিয়া অলঙ্কার শাস্ত্র শেষ করিল। বিদ্যার বিচারে শ্রীমন্ত সকলেরই অজেয় হইয়া উঠিল। বণিক্‌বালকের বিদ্যা ও তার্কিকতা জনার্দ্দন ওঝার সহ্য হইল না। একদিন শাস্ত্র প্রসঙ্গে তাঁহার সহিত ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত। সহজ-কুপিত ব্রাহ্মণ শ্রীমন্তকে জারজ বলিয়া কটূক্তি করিলেন। "পিতার উদ্দেশ নাই, এরূপ অবস্থায় যাহার জন্ম, মাতার সাধবা লক্ষণ ষোল আনা—আহারে আমিষ বিচার নাই, তাহার আবার ধনমান বিদ্যার গৌরব কি?—" ইত্যাদি অনেক অশ্রোতব্য কথা অধ্যাপক ও পুরোহিত জনার্দ্দন ওঝা শ্রীমন্ত সদাগরকে শুনাইয়া দিলেন। শ্রীমন্ত ঘরে আসিলেন, কিন্তু কাহাকেও কিছু না বলিয়া বিষণ্ণ মনে শয়ন করিয়া রহিলেন। পাঠশালা হইতে ফিরিবার সময় অতীত হইল দেখিয়া খুল্লনা পাঠশালায় গেলেন, জনার্দ্দনকে পুত্রের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। জনার্দ্দন পূর্ব্ব হইতে রাগত ছিলেন, খুল্লনার মুখের উপর তাঁহাকে অনেক গ্লানিজনক কথা বলিলেন। পুত্রের অন্বেষণার্থ গৃহের বহির্গত হওয়ায় যে লোকনিন্দা আছে তাহা বলিলেন পুত্রের অনুসন্ধানের উপলক্ষে এরূপ স্বাধীনতা গ্রহণ যে বড়ই নিন্দনীয় তাহা বলিয়া পরিশেষে শ্রীমন্ত যে পাঠশালা হইতে অনেকক্ষণ বাড়ী গিয়াছে তাহাও বলিয়া দিলেন।

খুল্লনা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে আসিয়া দেখিলেন—শ্রীমন্ত ঘরে আসিয়া সুদুঃখিত মনে শয়ন করিয়া আছেন। খুল্লনার সহিত কথোপকথনে সকল কথাই প্রকাশ পাইল—শ্রীমন্ত পিতার উদ্দেশ জন্য সিংহল যাত্রায় কৃতসংকল্প হইলেন। খুল্লনা কিছু দিন অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন, কারণ বাণিজ্যের কোন আয়োজন নাই—এক এক খানি নৌকা প্রস্তুত করিতেই এক বৎসর লাগিবে, তাহার পর বিনিময়

দ্রব্য সংগ্রহ—বাণিজ্যযাত্রা বলিবামাত্র হইবার নহে। কিন্তু শ্রীমন্ত কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। পিতৃদর্শনে তাঁহার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল, কিছুতেই ধৈর্য্য ধরিবার নহে। পুত্রের নির্ব্বন্ধ দেখিয়া খুল্লনা সম্মত হইলেন। বালক শ্রীমন্তর আগ্রহাতিশয্য দর্শনে দেবী ভগবতী সুপ্রসন্ন হইলেন, তিনি ডিঙ্গি নির্ম্মাণার্থ বিশ্বকর্ম্মা প্রভৃতি দেবশিল্পীকে মর্ত্তে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা আসিয়া একদিনে সপ্ততরী গড়িয়া ও সাজাইয়া ঠিক করিয়া দিলেন—সাতখানি সামুদ্র পোত ভ্রমরার জলে ভাসিতে লাগিল। কয়েক দিন মধ্যে বিনিময় দ্রব্যও সংগৃহীত হইল। অতঃপর শ্রীমন্ত রাজা বিক্রম কেশরীর অনুমতি প্রার্থনায় গমন করিলেন। রাজা শ্রীমন্তকে সমুচিত আদর যত্ন করিয়া কম্বলে বসিতে দিয়া পরিবারিক বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমন্ত সকল কথা তাঁহাকে বলিয়া পিতার উদ্দেশে সিংহল যাত্রার সংকল্প জানাইলেন। রাজা অনেক বুঝাইলেন, সিংহলে নানা বিপদের কথা বলিলেন, যাহাতে বালক শ্রীমন্ত দক্ষিণ পাঠনে যাইতে ক্ষান্ত হয়েন তাহার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বালকের অচলা পিতৃভক্তির জলন্ত পরিচয় পাইয়া পরিশেষে রাজা অনুমতি দিতে বাধ্য হইলেন।

কোনমতে পুত্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারিয়া খুল্লনা সাশ্রুলোচনে দেবী ভগবতীর পূজার অনুষ্ঠান করিলেন। ভ্রমরার তটে সমস্ত আয়োজন হইল—সুবর্ণঘটে খুল্লনা যথাবিধি দেবী মহামায়ার পূজা ও স্তবস্তুতি করিলে দেবী প্রসন্না হইয়া খুল্লনার প্রত্যক্ষীভূতা হইলেন। খুল্লনা সেই সময়ে শ্রীমন্তকে আপদে বিপদে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। দেবী তাঁহাকে অভয়দান করিয়া সান্ত্বনা করিলেন। খুল্লনা শ্রীমন্তকে বলিয়া দিলেন,—"আপৎকালে মা জগদম্বাকে স্মরণ করিলে কোন বিপদ থাকিবে না। আমি তাঁহার উপর আত্মনির্ভর করিয়া সম্পদে সুখ ধরি নাই, বিপদে দুঃখ ধরি নাই। তুমি সেইরূপে তাঁহতে আত্মনির্ভর করিবে।" এই সময়ে তিনি শ্রীমন্তর পিতৃনিদর্শন আতপত্র ও অঙ্গুরী এবং অষ্ট তণ্ডুল ও দূর্ব্বা তাহার হাতে দিলেন। দেবী মঙ্গলচণ্ডিকার হস্তে শ্রীমন্তকে সমর্পণ করিয়া খুল্লনা পুনরায় রোরুদ্যমানা হইলে দেবী তাঁহাকে অভয়দান করিলেন। শ্রীমন্ত অতঃপর দেব দ্বিজ সকলকে প্রণাম করিয়া বিমাতৃচরণে প্রণত হইলে পাপীয়সী লহনা তাঁহার অকল্যাণ কামনায় বলিল—"তোমাকে আর যেন উজানী ফিরিতে না হয়। ইহাতে খুল্লনার মন অনেকটা ক্ষুন্ন হইল, কিন্তু দেবীর প্রসন্নতায় সে কথা মনেও ধরিল না। শ্রীমন্ত নৌকারোহণে সিংহল যাত্রা করিলেন। খুল্লনা পুত্রকে বিদায় দিয়া বিষন্ন মনে, শূন্যহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। কে বলে বাঙ্গালী চিরদিন ভীরু—বণিতার বস্ত্রাঞ্চল তাহাদের সম্বল—কে বলে বঙ্গীয়

বধূ সহজে কাতর—তাহা হইলে ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক পুত্রকে কখন সুদূরবর্ত্তী সিংহলে পাঠাইয়া খুল্লনা প্রাণ ধরিতে পারেন ?

প্রকৃত প্রস্তাবে খুল্লনা-চরিত্র এইখানেই সমাপ্ত। পুত্রকে সিংহলে পাঠাইয়া তাঁহার প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত তিনি কেবল আদ্যাশক্তি ভগবতীর পূজার্চ্চনা ও শ্রীপাদ-পদ্ম চিন্তায় কালাতিপাত করিতেন। এ দেশের যাত্রা সম্প্রদায় যে শ্রীমন্তের মশান পালা অভিনয় করিয়া থাকেন, তাহার আরম্ভ শ্রীমন্তের বিদ্যাশিক্ষা হইতে। শ্রীমন্তের মশানের সহিত খুল্লনা-চরিত্রের সংস্রব বড়ই কম। কিন্তু ধনপতি সদা-গরের উপাখ্যানের অবশিষ্টাংশ এস্থলে না বলিলেও কৌতূহল নিবৃত্তি পায় না। এজন্য অতি সংক্ষেপে তাহা বলিতে হইল।

শ্রীমন্ত অজয় বাহিয়া ভাগীরথীর বক্ষের উপর দিয়া সিংহলাভিমুখে বহিত্র চালাই-লেন। ক্রমে গঙ্গাসাগর সঙ্গমস্থল নিকট হইল—মগরার মোহানায় পহুছিয়া শ্রীমন্ত সামুদ্র জলের গভীর নির্ঘোষ শুনিতে পাইলেন, অকাশ নিবিড় ঘনঘটা সমা-চ্ছন্ন ও বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত হইতে লাগিল, ক্রমে প্রবলবেগে ঝটিকা বহিতে লাগিল। তাহার সহিত বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। শ্রীমন্ত চিন্তাকুল হইয়া মাতৃআজ্ঞা স্মরণ করিলেন, প্রাণ মন সংযোগে দেবী ভগবতীর ধ্যান করিতে লাগিলেন। দেবীর অনুগ্রহে অল্পকাল মধ্যে ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেল। ধীরে ধীরে নৌকা চলিতে লাগিল—পথে আর কোন বাধা বিঘ্ন ঘটিল না। কিন্তু সিংহলের কালী-দহে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সেই কমলে কামিনীর ছলনায় পতিত হইতে হইল। তিনিও রাজসভায় উপস্থিত হইয়া কথা প্রসঙ্গে কমলে কামিনীর কথা তুলিলে রাজা তাহা অপ্রত্যয় করেন, উভয় পক্ষে প্রতিজ্ঞা পত্র পূর্ব্ববৎ লিখিত হয়, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে দক্ষিণ মশানে শ্রীমন্তের শিরশ্ছেদের আজ্ঞা হইল। সহর কোটাল প্রাণদণ্ডের জন্য তাঁহাকে লইয়া মশানে উপস্থিত হইলে দেবী ভগবতী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে তাহা-দের নিকটবর্ত্তী হইয়া শ্রীমন্তের প্রাণভিক্ষা করিলেন—কোটাল তাহাতে আপনার অসমর্থতা জানাইলে দেবী সর্ব্বসমক্ষে আপনার নাতি পরিচয় দিয়া শ্রীমন্তকে কোলে লইয়া বসিলেন। কোটাল বারম্বার শ্রীমন্তকে ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলে তাহা রক্ষা পাইল না। ব্রাহ্মণী শ্রীমন্তকে ছাড়িলেন—ক্রমে কোটাল অস্ত্র ত্যাগেও কৃতকার্য্য হইল না—নিক্ষিপ্ত অস্ত্র ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী অতঃপর যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন—ভূত প্রেত দানা-গণ সৈন্য সেনাপতি—উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ—যুদ্ধে কোটালের পরাজয় হইল, সে গিয়া সমস্ত বিষয় রাজাকে জানাইল—রাজা স্বয়ং সজ্জিত হইলেন।

রাজা যুদ্ধস্থলে উপস্থিত, বহুসংখ্যক সৈন্য বিনষ্ট হইবার পর বুঝিলেন দেবী ভগবতী শ্রীমন্তের সহায়। অতএব যুদ্ধ

করিয়া কোন ফল হইবে না—সন্ধির প্রস্তাব হইল। রাজা শালবান্ দেবীর পাদ-পদ্ম ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, দেবীর আজ্ঞায় তাঁহার কন্যার সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ধনপতি সদাগরের মুক্তিলাভ, বাজেয়াপ্ত জিনিষের পুনরুদ্ধার, অচির-কাল পরেই সিংহল হইতে বরকন্যার বিদায়, ধনপতির মহাশক্তির প্রাধান্য স্বীকার—প্রত্যাগমন কালে মহামায়ার অনুকম্পায় মগরায় ধনপতির ছয়খানি জলমগ্ন তরীর উদ্ধার। দেশে আসিয়া ধনপতি পুত্রকে লইয়া রাজ-দর্শনে গমন করিলে রাজা সিংহলে কমলে কামিনীর ব্যাপার শুনিয়া তাহা অবিশ্বাস করিলেন, সদাগর নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলে শ্রীমন্ত ভগবতীকে প্রসন্ন করিয়া ভ্রমরার দহে কমলে কামিনী দেখাইলে বিক্রমকেশরী আপন প্রতিজ্ঞানুসারে শ্রীমন্তকে আপন কন্যা দান করিলেন। ইহার পরেই খুল্লনাও মালাধরের শাপের বিমোচনকাল উপস্থিত হইল—স্বর্গ হইতে পুষ্পক রথ আসিল। খুল্লনা শ্রীমন্ত ও দুই বধূকে লইয়া স্বামীকে অনেক বুঝাইলেন, দেবীর কৃপায় তাঁহার বংশ রক্ষা হইবে, সংসারে সুখী স্বচ্ছন্দ হইবেন, এইরূপে অনেক প্রবোধ দিয়া রথে আরোহণ করিলে বায়ু বেগে রথ অন্তরীক্ষে উড্ডীয়মান হইল। খুল্লনা স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহার মর্ত্ত্যলীলা শেষ হইল।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

পাচন ও মুষ্টিযোগ।

১। বৃশ্চিকদংশনের ঔষধ। ভিনি-গারের ন্যায় কার্ব্বলিক্ তৈল এক ফোঁটা দষ্টস্থানে লাগাইলে জ্বালা নিবারণ হয়।

২। বিচ্ছুদংশনের ঔষধ। আকন্দ গাছের কচি ডগার আটা দষ্টস্থানে মর্দ্দন করিলে এবং ঐ আটা আঙুলে মাখাইয়া সেই আঙুল দষ্ট ব্যক্তির নাসারন্ধ্রে বারংবার প্রবিষ্ট করাইলে, শীঘ্র অতি আশ্চর্য্য উপকার হয়।

৩। ফোঁড়ার ঔষধ। শুষ্ক কচুপাতা ফোঁড়ার উপর দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে ফোঁড়া শীঘ্র সারিয়া যায়।

৪। রোগীর ভীষণ বমন ও পিপাসা নিবারণের ঔষধ। আমপাতা ১ তোলা এবং জামপাতা ১ তোলা আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধপোয়া থাকিতে নামা-ইয়া তাহাতে একটু মধু দিয়া, সেই জল অল্প অল্প সেবন করিলে অল্প সময়েই বমন ও তৃষ্ণার শান্তি হয়।

৫। রক্ত স্রাবের ঔষধ। বিশল্যকরণী অর্থাৎ আয়াপানের পাতা ৫।৭টী বাটিয়া তাহাতে চিনি মাখাইয়া সেবন করিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

(ক্রমশঃ)

নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।

১। কুমারসম্ভব কাব্য। ব্যাখ্যার সহিত সরল গদ্যে মহাকবি কালিদাসের কুমার সম্ভব কাব্যের ভাবানুবাদ, শ্রীদীন নাথ সান্যাল বি, এ, এম, বি, কৃত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

সান্যাল মহাশয় প্রবীণ ডাক্তার। জীবের রসধাতু প্রভৃতি দেহতত্ত্বের বিজ্ঞানে ও বিশ্লেষণে তাঁহার সমকক্ষ অনেক থাকিতে পারেন, কিন্তু কাব্য-দেহের রসধাতু বিজ্ঞানে ও বিশ্লেষণে এমন বিচক্ষণ কয়জন আছেন, জানিনা। তিনি কুমারসম্ভব বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন। এই গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠা ভূমিকা অপূর্ব্ব বস্তু, ইহা সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য নিধিরূপে চির-পূজিত হইবে।

২। রেণুকণা। ৩। সতীলীলা। দুই খানি গ্রন্থই শ্রীনিস্তারিণী দেবী প্রণীত। মূল্য ॥০ ও ।৵০ আনা। মুদ্রাঙ্কন অতি সুন্দর। দুইখানিই সুনীতিগর্ভ নবন্যাস। অন্তর্জগতের ও বহির্জগতের বৈচিত্র্য ইহাতে সুন্দরভাবে অঙ্কিত ও প্রস্ফুটিত। লেখা সরল ও মধুর পাঠকালে বর্ণিত ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হয়। গ্রন্থকর্ত্রী বামাবোধিনীর সুপরিচিত লেখিকা, ইহার বিষয়ে আমাদের অধিক বলা ভাল দেখায় না। সহৃদয় পাঠকগণকে গ্রন্থ দুইখানি পড়িতে বারবার অনুরোধ করি।

নূতন সংবাদ।

১। যে গৃহবিচ্ছেদ মহাপাপের ফলে এই ভারতভূমি আজি দুর্গতির চরম সীমায় উপস্থিত, সেই মহাপাপের শাস্তির জন্যই— জাতীয় কংগ্রেস সভার প্রতিষ্ঠা। সুদীর্ঘ কাল মেঘাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনের পর সূর্য্যদর্শনের ন্যায় আমরা এই জাতীয় সম্মিলনীর অভ্যুদয়কে প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গন করিলাম। আবার এ দগ্ধ হৃদয়ে আশাবীজ অঙ্কুরিত হইল। ক্রমে তাহা পল্লবিত ও ফলোন্মুখ হইল। পাষণ্ড পিশাচ রাক্ষস আমরা, আমরাই আবার সেই আশালতার মূলে কুঠার হানিলাম! ধিক্ আমাদের জন্মে ও কর্ম্মে। আমরা যেন আর "স্বদেশ" "মাতৃভূমি" এ সকল নাম মুখেও না আনি, 'মনুষ্য' বলিয়া পরিচয় না দি।

"প্রেমাম্বুভিঃ স্বগৃহবৈরকলঙ্কপঙ্কং
প্রক্ষাল্য জন্মধরণীজননীহিতায়।
দেহাত্মজীবনধনৈর্মিলিতা যতধ্বম্
সিদ্ধিং দদাত্বখিলমঙ্গলমূলমীশঃ॥
সুপবিত্র প্রেমবারি করিয়া সেচন,
গৃহবৈর পাপপঙ্ক করহ ক্ষালন;
সবে মিলি জন্মভূমি জননীর তরে,

ধন প্রাণ দেহ আত্মা দাও অকাতরে;
সর্ব্ব মঙ্গলের মূল সর্ব্ব শক্তিমান্
ভগবান্ শক্তি সিদ্ধি করুন প্রদান॥"*

এ সকল কথা লিখিয়া কবিরত্ন মহাশয় অরণ্যে রোদন করিয়াছেন।

২। রামকৃষ্ণ মিসনের অধ্যক্ষগণ পূর্ব্বের ন্যায় এবারও দুর্ভিক্ষ পীড়িতগণের সাহায্যে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, নানা স্থান হইতে চাঁদা সংগ্রহের জন্য সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। প্রত্যেকেরই যথাসাধ্য এ কার্য্যে সাহায্যদান একান্ত কর্ত্তব্য। এই সকল কার্য্যই খাঁটী স্বদেশী।

৩। বঙ্গের মহামান্য ভূম্যধিকারী সার মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর বাহাদুর গত ২৪ শে পৌষ বৃহস্পতিবার রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। শ্মশান ঘাটে বড়লাট ও ছোটলাটের প্রতিনিধি এবং সহরের অধিকাংশ গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে কেল্লা হইতে ২১ বার তোপধ্বনি হইয়াছিল। এবং কেল্লার ব্রিটিশ পতকা ১৫ দিনের জন্য অর্দ্ধ পথে অবস্থিতি করিয়াছিল। এই মহাত্মার বিয়োগে বঙ্গবাসিগণ একজন সাহিত্যবন্ধু, বিনয়ী, দয়ালু ভূম্যধিকারী হারাইলেন।

৪। হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৮ মাসের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত লালমোহন দাস তাঁহার স্থান লাভ করিয়াছেন।

৫। আফ্রিকায় বিট্রিশ গায়নার ব্রেজীলের সীমানায় ডাক্তার হঁরেং বস্তেলিয়স নদের একটী জলপ্রপাত আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহা ৩০০ ফিট উচ্চ এবং ২০০ ফিট প্রশস্ত। অধিনিবাসের (শাসনকর্ত্তার নিকট এই আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করিবার) সময় আবিষ্কর্ত্তা শাসনকর্ত্তার নামানুসারে যাহাতে এই নূতন প্রপাতের নাম "চেম্বারলেন প্রপাত" রাখা হয় এই অনুরোধ করেন। এই প্রপাত এতকাল জনসাধারণের অগোচর ছিল এবং ইহা উচ্চতায় নায়াগ্রা প্রপাতকে পরাস্ত করিয়াছে। ঈশ্বরের এই অনন্ত বৈচিত্র্যময়ী সৃষ্টিতে অদ্যাবধি যাহা আবিষ্কৃত হয় নাই তাহার তুলায় যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা মহাসিন্ধুর একটী বিন্দুও নহে।

বলিদান।

সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

ঘন বনরাজি তলে,
আলো ও ছায়ার মাঝে,
রচিয়া কুটীর ক্ষুদ্র,
নির্ম্মল পবিত্র সাজে

* শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন কৃত স্বদেশীর প্রাতঃকৃত্য।

থাকিত বালিকা এক,
অস্ফুট কুসুম কলি ;
জগতে তাহার কেহ,
ছিল না আমার বলি।
অনিল বহিয়া তারে,
দিত ফুল-পরিমল ;
সুধাংশু ঢালিয়া দিত,
স্নিগ্ধ রশ্মি নিরমল।
প্রভাতে প্রদোষে আসি,
পাখীরা ধরিত তান ;
বেড়িয়া কুটীর খানি,
তটিনী শুনাত গান।
কানন-সঙ্গিনী তার,
আসি কুরঙ্গিনীগণ।
করিত বালার সনে,
ফুল্ল মনে বিচরণ।
বিটপী করিত তারে,
মিষ্ট মধু ফল দান ;
নিশীথে শুনাত ঝিল্লী,
মনোহর ঐকতান।
দুবেলা আঁচল ভরি,
তুলিত প্রসূন বালা ;
সাজাত কুটীরখানি,
দোলায়ে কুসুমমালা।
সংসারের আবিলতা,
কখন স্পর্শেনি তারে ;
আপনি থাকিত ফুটে,
আপন সৌন্দর্য্যভারে।
এমনি সুখেতে তার,
গিয়াছিল কত দিন ;
সহসা কি জানি হায় !
হলো বালা স্ফূর্ত্তিহীন।
সরলতা-মাখা মুখে,
দেখা দিল চিন্তারাশি।
লুকাল জনম মত,
অধরের চারু হাসি।
ক্রমেতে শুকাল বালা,
তাপদগ্ধ পুষ্প মত।
কি জানি কি চিন্তা বিষে,
হলো তার হৃদি ক্ষত।
একদা পূর্ণিমা রাতে,
ছিন্ন শতদল মত ;
মুক্ত বাতায়ন হতে,
পড়িয়া হইল হত !
লুটায়ে পড়েছে আহা !
মৃণাল প্রকোষ্ঠ খানি ;
চম্পক-অঙ্গুলি-মাঝে,—
লিপিতে ভীষণ বাণী।
"শুধু নিমিষের ভুলে,
হয়েছিনু পথ হারা ;
তাইত তোমার অঙ্ক,
যাচি আজি ভবদারা।
পৃথিবীর কুটিলতা,
জানিনাত কোন কালে ;
তবু কেন এত দুঃখ,
লিখে ছিলে মম ভালে ?
শুভ্র জীবনেতে মোর,
পড়েছে কলঙ্ক-কালী !
না রাখিব ছার প্রাণ,
দিনু ও চরণে ডালি।"
হায় রে শুকাল বালা,
কুটিলের ছলনায় !

না ফুটিতে ভাল করে,
নির্ম্মমের গুপ্ত ঘায়।
সমাজ শ্মশানে হায়!
রাখিতে পবিত্র মান।
নীরবে নিষ্পাপ বালা,
দিল আত্ম বলিদান।
কিন্তু যার অত্যাচারে,
বালিকা ত্যজিল প্রাণ।
সমাজে চাহিয়া দেখ,
সেই মহা ভাগ্যবান্!

এমনি স্নেহের ধন,
নিষ্ঠুর পিশাচ করে।
প্রতিদিন শত শত,
অকালে পড়িছে ঝরে।
যদ্যপি সমাজ হায়!
চাহিত সে ম্লান মুখ।
তা হলে কি চির তরে,
বিসর্জ্জিত তারা সুখ?

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

Bamabodhini Patrika.

AN APPEAL. UMESH CHANDRA DATTA MEMORIAL FUND.

By the sudden death of Babu Umeshchandra Datta India has become poorer. In him the women of India specially have lost a true and sincere friend. The example of strenuous and unwearied labour for the highest good of the country which this good man leaves behind him is worthy of imitation by every son and daughter of India. To him every good work, whether in the field of politic[al] reform, education or philanthropy, was part of his religious duty.

In order to consider the best means of preserving a memento of his life, which will keep his memory fresh in our midest, a few ladies met at 139 Dhurrumtola Street on the 19th July last. It was decided to raise a permanent fund in the name of the deceased, the interest of which will be spent to meet the educational expenses of poor girls. As Babu Umeshchandra Datta laboured for all classes of people irrespective of their caste or creed, help will be given to girls of every community and denomination irrespective of their caste or creed. We are gratified to announce that our efforts have been rewarded with success beyond our expecations, We require at least Rs. 3000 for the purpose. We will hope that the friends and admirers of the deceased will earn the blessings of God by contributing to the Fund according to their means.

I am seriously ill and laid up in bed. It is very gratifying to state that I have deposited more than Rs 500 in the Bank, and if all the admirers of late Mr. Dutt contribute something it will not be very long to realize the insiginficant sum of Rs 3000. Had he been born in any country except India, where it is a very regretable fact that those who have money have no heart towards good work, money would have been poured forth. Rich Indian, both ladies and gentlemen, if they could contribute even one tenth of the money they spent in luxury the period of মৈত্রী and গার্গী would have reigned.

SWARNAPRABHA BOSE.

93 Upper Circular Road, Calcutta.

২১৷৩ নং মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও শ্রীসুকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 534. February, 1908

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি. এ. কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

৪৫ বর্ষ। ৫৩৪ সংখ্যা। { মাঘ, ১৩১৪। ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮। } [illegible] কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

১। সৎকর্ম্ম—জোড়াসাঁকোর শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ কনকেন্দ্র ঠাকুরের শুভ বিবাহোপলক্ষে বেলগেছিয়ার আলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতালে রোগীদের শুশ্রূষার জন্য তিন হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই সাধু দৃষ্টান্ত সকলের অনুকরণীয়।

২। ট্রান্সভালে ভারতবাসী—দক্ষিণ আফ্রিকায় ট্রান্সভাল প্রবাসী ভারতবাসীদিগের প্রতি অত্যাচার এখনও সমভাবেই চলিতেছে। এ বিষয় ভারতের গভর্ণরের কর্ণগোচর করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে তাহার কোন হাত নাই এইরূপ বলিয়াছেন এবং উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সেই আবেদন পত্র পাঠাইবেন বলিয়াছেন।

৩। শিল্প ও বিজ্ঞান বিস্তার সমিতি—শিল্প ও বিজ্ঞান বিস্তার সমিতি হইতে প্রতিবৎসরে অনেকগুলি বঙ্গীয় যুবক শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত নানা দেশে প্রেরিত হয়। এবৎসর ৮০ জন বঙ্গীয় যুবক শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার্থ ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান, জর্ম্মনি ফ্রান্স, প্রভৃতি স্থানে যাইতেছেন। এই সমিতির উদ্‌যোগে দেশের বহুদিনের অভাব দূর হইতেছে।

৪। অর্দ্ধোদয় যোগ ও স্বেচ্ছাসেবক দল—অর্দ্ধোদয়যোগ উপলক্ষে নানা দেশ হইতে অজস্র যাত্রী গঙ্গাস্নানোপলক্ষে কলিকাতায় আগমন করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপালিটী যাত্রিদিগের নানারূপ অসুবিধা ও রোগের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। এইরূপ বহুলোকের সমাগমে যাত্রীগণ পুলিশের নিকট প্রায়ই অত্যন্ত নিগৃহীত হয়, সেই জন্য কলিকাতাবাসিগণ বিদেশাগত যাত্রীদিগের সেই কষ্ট দূর করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল সংগঠন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট

যাত্রীদিগের রক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। স্বেচ্ছাসেবক দলের কায়মন যত্ন ও পরিশ্রমে যাত্রীরা কষ্ট পান নাই। তাঁহাদের এই সাধু উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়।

৫। উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ—উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের প্রাণরক্ষার্থ কটকের অনারেবল মধুসূদন দাসের কন্যা শ্রীমতী শৈলবালা দাস ও কলিকাতার মহিলা মিশনরী মিস্ এম. আই গিলবার্ট বিপুল অধ্যবসায় সহকারে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।

৬। ডাক বিভাগে রমণী—মার্কিন আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রদেশে রমণীরা পুরুষোচিত সকল কার্য্যেই যোগদান করিয়া থাকেন। শিক্ষা বিভাগ, ডাক বিভাগ, রেল বিভাগ প্রভৃতি সকল বিভাগেই রমণীরা প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে ও বড় বড় আফিসে চিঠীপত্র ছাপিবার জন্য টাইপ রাইটার স্ত্রীলোক নিযুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে রেলেও ফিরিঙ্গী মহিলা টিকিট বিক্রেত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি ডাক বিভাগের টেলিগ্রাম গ্রহণ ও প্রেরণের জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ মহিলা নিয়োগের প্রস্তাব করিতেছেন।

৭। কলিকাতা মূক বধির বিদ্যালয়—মূক ও বধিরেরা কখনও বাক্যদ্বারা নিজেদের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না ইহা এতকাল এ দেশবাসীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু মূক বধির বিদ্যালয় তাঁহাদের সে বিশ্বাস দূর করিয়া প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছেন। এই বিদ্যালয় হইতে অনেকগুলি মূক ও বধির নানারূপ শিল্প ইত্যাদি শিক্ষা করিয়া ও কথা বলিতে শিখিয়া সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবনাতিপাত করিতেছে। গত বর্ষে নিম্ন প্রাইমারি পরীক্ষায় এই বিদ্যালয় হইতে শ্রীমান্ মৌলীভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসরের জন্য ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়াছে। এই বিদ্যালয়ে এক্ষণে ৫০টী বালক বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে।

৮। কর্পূর তলার নূতন রাণী—কর্পূর তলার মহারাজা সম্প্রতি একটী বিদুষী হিস্পানী মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। বিবাহ কার্য্য শিখধর্ম্মানুমোদিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহের সময় কন্যা দেশীয় ভাবে সোণার সল্মা চুম্কীর শাড়ী পরিয়া বিবাহ করিতে বসিয়াছিলেন।

সংসার।

রে সংসার!
তোর মুখ শুধু মম ত্রাস দেয় প্রাণে,
সংসার! হেরিনু তোকে বল্ কি কুক্ষণে?
কি বন্ধুতা তোর সনে? শুধু অবিশ্বাস,
কঠোর মুরতি সদা দেয় প্রাণে ত্রাস,
অসীম আতঙ্কে প্রাণ সদাই কম্পিত,

ও মুখ দেখিয়ে ভয়ে এ আঁখি মুদিত,
সম্পদেও ঐ মূর্ত্তি প্রাণে দিত ভয়,
এবে কার লাগি বল্ রাখি পরিচয়।
তুই যে এমন সখা হবিরে আমার,
এই কথা বাজে প্রাণে নিঠুর সংসার।
কার তরে আছি হেথা বল রে সংসার!
নিশি দিন ব্যস্ত মন যেতে ঐ পায়।
সংসার! মিনতি তোরে দূরে রাখ মোরে,
একটু শকতি চাই উর্দ্ধে উঠিবারে।
বিভু মোরে বল দিন উড়ি অনিবার,
কঠোর সংসারে থাকি কিসের আশায়?
চাহি আমি বিশ্বাসীর মনোহর প্রাণ,
রে সংসার! কার সাধ্য করে তাহা দান?
(হে আরাধ্য!) সেই বর দাও মম পরাণ সম্বল,
যত দিন ভবে রাখ, দাও কিছু বল।
সংযম নিষ্ঠাতে শুদ্ধ হউক জীবন,
তোমার পদেতে দৃঢ় থাকে যেন মন।
অতৃপ্ত পরাণ মাঝে নিত্য দাও দেখা,
সকাতরে নিবেদন শুন প্রাণসখা!

আমরা কি চাই।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৩) শিক্ষা—জীবনসংগ্রাম ক্রমশই কঠোর হইয়া দাঁড়াইতেছে। যাহাকে আজ কাল "সভ্য" জগৎ বলে, তাহার সঙ্গে প্রতিযোগিতা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই; এবং সেই প্রতিযোগিতায় এক মাত্র ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞান। যাহাতে এই প্রচণ্ড প্রতিযোগিতায় টেঁকিতে পারি এরূপ শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের উপায় আমাদের আছে কি? ইহা ত বড় কথা, দেশের কয়জন লোক সামান্যরূপ লিখিতে ও পড়িতে জানে? পুরুষের মধ্যে এরূপ লোক শতকরা কয় জন আছে? স্ত্রীলোকের কথা ধরিবারই দরকার নাই। কারণ, জগতের সকল সভ্য দেশেই স্ত্রীশিক্ষা অপেক্ষা পুরুষ-শিক্ষা বেশীদিন হইতে প্রচলিত এবং লিখিতে, পড়িতে জানে এমন পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকের চেয়ে অধিক। আমাদের দেশে পুরুষ শিক্ষাই যৎসামান্য আছে, স্ত্রীশিক্ষা নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয়না। পুরুষ-শিক্ষা যাহা আছে তাহার অবস্থাও অতি শোচনীয়। গ্রাম্য পাঠশালা হইতে আরম্ভ করা যাউক। সেখানে পাঠার্থীদিগকে সামান্যরূপ লিখিতে পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে শিক্ষা দেওয়া হয় মাত্র। শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকায় অনেক বিষয়ের নাম আছে বটে, যথা, স্বাস্থ্যরক্ষা, কৃষিবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ইত্যাদি, ইত্যাদি, কিন্তু ঐ সব নাম কেবল তালিকার শোভা বৃদ্ধি করে মাত্র। শিখাইবার লোক নাই, আবশ্যকীয় যন্ত্র উপকরণাদি নাই, হাতে কলমে কিছু হয় না, এবং অবস্থা বিবেচনা করিলে হইতে পারেও না। যে শাস্ত্রের আমার প্রায় কিছুই জ্ঞান নাই সে শাস্ত্র

যে আমি পড়াইতে পারি, এ কথা আমাদের দেশ ছাড়া অন্ত কোথাও কেহ বিশ্বাস করে না, এবং কার্য্যকরী বিজ্ঞান যে যন্ত্রাদি ও পরীক্ষার সাহায্য বিনা শিখান যাইতে পারে ইহা অন্ত কোন দেশে কল্পনায়ও আসে না। এদিকে যে বিজ্ঞান শিক্ষা হাতে কলমে নয়, সে শিক্ষার কোন মূল্য নাই, তাহা অন্ত সর্ব্বত্র স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত। যখন পুরুষ শিক্ষায় এই অবস্থা, তখন স্ত্রীশিক্ষার বিষয় কিছু না বলাই ভাল। কোথাও কোথাও দুই একটী বালিকাবিদ্যালয় দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে কি শিক্ষা দেওয়া হয় বুঝা ভার। দুই একজন প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ পণ্ডিত আছেন। বয়সগুণেই তাঁরা শিক্ষকতা কাজে নিযুক্ত। শিক্ষা দিবার উপকরণাদির অবস্থা যদি সম্ভব হয়, বালক বিদ্যালয়গুলির অপেক্ষাও হীন। গৃহকর্ম্মে আবশ্যক এরূপ দুই একটা বিষয় শিখাইবার কথা আছে বটে, কিন্তু শিখায় বা কে, এবং শিখান হয়ই বা কি প্রকারে? আর এই সব বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা? সে কথা না তুলাই ভাল। নিম্ন শিক্ষা সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে চাই না, পুথি বাড়িয়া যায়।

ইহার পর মধ্যশিক্ষা। যে সব বিদ্যালয়ে মধ্যশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাদের কাজ নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ছাত্র প্রস্তত করা। সরকারি ও বেসরকারি, এরূপ বিদ্যালয় দেশে কতকগুলি আছে বটে, কিন্তু একটী উন্নতিশীল দেশে যতগুলি থাকা উচিত তাহার চেয়ে ঢের কম। শিক্ষাপ্রাপ্তির উপযুক্ত বালকদের মধ্যে শতকরা খুব অল্প পরিমাণই এ সব বিদ্যালয়ে গিয়া থাকে। শিক্ষার ভাষা উচ্চতর শ্রেণীতে ইংরাজী। শিক্ষণীয় বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। শিক্ষা যে কতদূর উচ্চ এক কথাতেই বুঝা যাইবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিয়াছেন যে সামান্ত বিজ্ঞান শিখাইবার বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতা অধিকাংশ বিদ্যালয়েরই নাই এবং সেই জন্য তাহা প্রবেশিকা পরীক্ষায় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের অন্তভু ক্ত নয় বলা যাইতে পারে। যে টুকু কাজ ইহারা করিতে পারে, অর্থের, কর্তৃপক্ষদের জ্ঞান ও চেষ্টার, এবং উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে এবং অভিভাবকদের অজ্ঞতা ও নিচেষ্টতার নিমিত্ত তাহাও ভাল করিয়া হয় না। প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের "পাশ ফেলের" তালিকা ইহার প্রমাণ। এই সব বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নামে কলেজের জন্য ছাত্র তৈয়ার করা, কিন্তু কাজে ইহারা কেরাণী তৈয়ার করার যন্ত্র মাত্র।

এখন উচ্চ শিক্ষার দিকে একবার তাকান যাউক। ইহা দেওয়া হয় কলেজে। দেশে কলেজ আছে গুটিকয়েক মাত্র, এবং তাহাদের ছাত্র সংখ্যা একত্র করিলে মুষ্টিমেয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙ্গালা বেহার, উড়িষ্যা, আসাম ও ব্রহ্মদেশ এই কয়টী প্রদেশের উচ্চ শিক্ষার উপর কর্তৃত্ব করেন। এই সমস্ত প্রদেশ হইতে প্রতি বৎসর ৭।৮ হাজার ছাত্র প্রবেশিকা

পরীক্ষা, ৩৩৩০ হাজার ছাত্র মধ্য পরীক্ষা এবং দুই হাজার বা তাহার কিছু বেশী ছাত্র বি, এ, পরীক্ষা দেয়। এম, এ, পরীক্ষার জন্য অপেক্ষাকৃত খুব কম ছাত্রই প্রস্তুত হয়। ইহা হইতেই দেশে উচ্চ শিক্ষার কিরূপ প্রসার বুঝা যায়। ছাত্রসংখ্যার অবস্থা ত এইরূপ। শিক্ষণীয় বিষয় কি কি? পৃথিবীর প্রধান পুরাতন ভাষা ও সাহিত্য, গুটিকতক নূতন ভাষা ও সাহিত্য (ইহার মধ্যে ইংরাজী প্রধান) দর্শন, গণিত ও বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখা। ইহা ত গেল নামে। কাজে কিন্তু অনেক গুলি বিষয় শিখাইবার দেশে কোন বন্দোবস্ত নাই, এবং অনেকগুলির যাহা আছে তাহা ছেলেখেলা মাত্র। এক কথায় সব বুঝা যাইবে। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ক্রিয়াসিদ্ধ পরীক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই। এ কথা এখানে বলা উচিত যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মানুসারে এ বিষয়ের কিছু পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে। কাজের এখনও দেরী আছে। বর্ত্তমানে বিদ্যা যদি কিছু হয় তাহা কেবল পুঁথিগত। যাঁহারা ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি উন্নত দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত ও আয়োজনের কোন সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রণালী প্রহসন বই আর কিছুই নয়। কথাটা হইতেছে এই— এখানে যাহাকে উচ্চ শিক্ষা বলা যায় তাহা আর যাহা হউক হইতে পারে, কিন্তু "উচ্চ" একেবারে নয়। একে ত শিখান খুব কমই হয়, তাহার উপর যাহা শিখান হয় তাহা সচরাচর ভাল করিয়া হয় না। দেশীয় যে সব অধ্যাপক আছেন তাঁরা অনেকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্ট। কাজেই তাঁদের বিদ্যা ও জ্ঞানের সীমা বহুদূর বিস্তৃত নয়। বিলাত হইতে যে সব অধ্যাপক আসেন, তাঁহারা প্রায়শঃ উচ্চ অঙ্গের লোক নন। সে প্রকার লোক বিদেশে আসিতে চান না, এবং আসা তাঁদের দরকারও হয় না। এমন কি বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকারী লোক প্রায় এ দেশের শিক্ষাবিভাগে দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্লার্ক, টনি, ইলিয়ট, ম্যান্ ও বুণের মত লোক কয়জন এ দেশে আসিয়াছেন? দেশীয় ও বিদেশীয় অধ্যাপক সম্বন্ধে যাহা বলিলাম ইহার অবশ্য ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু মোটের উপর কথাটা যে ঠিক্ তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন বলিয়া বোধ হয়। এ অবস্থায় শিখাইবার ইচ্ছা থাকিলেও বেশী ক্ষমতা অনেকের নাই। ইচ্ছা না থাকিলে ত কথাই নাই। উচ্চ শিক্ষার এরূপ অবস্থার ফল যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ দেখা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী দুই চারি জন সাহিত্যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু দর্শন, গণিত বা বিজ্ঞানে মৌলিকতার বা গবেষণার জন্য খ্যাতি লাভ আজ পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই বলিলেই হয়। করিবেনই বা কোথা হইতে? গবেষণা ত ছেলেখেলা

নয়। ইহার উপযুক্ত শিক্ষা কোথায়? ইহার উপায় কোথায়? ইহাতে উৎসাহই বা দেয় কে? এ সম্বন্ধে বেশী লিখিয়া আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই।

দেশের পুরুষদের মধ্য ও উচ্চ শিক্ষার অবস্থা কিঞ্চিৎ বিবৃত হইল। ইহা হইতে স্ত্রীলোকদের মধ্য ও উচ্চ শিক্ষার অবস্থা অনেকটা অনুমিত হইতে পারে। তাঁহাদের জন্য দুই একটা স্কুল ও এক আধটা কলেজ আছে মাত্র।

ব্যবহারিক শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। প্রকৃত ব্যবহারিক শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত আমাদের দেশে নাই। শিবপুর কলেজে যান্ত্রিক স্থপতি বিদ্যা, বৈদ্যুতিক স্থপতি বিদ্যা, খনি সম্বন্ধীয় স্থপতি বিদ্যা, সাধারণ স্থপতি বিদ্যা, কৃষি বিদ্যা এবং আর দুই একটা বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু ব্যবহারিক শিক্ষার আজকাল কত শাখা হইয়াছে যাহার নাম পর্য্যন্ত এ দেশে শুনিতে পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া শিবপুর কলেজে পড়িবার উপযুক্ত বিদ্যা ও অবস্থা দেশের কয় জনের আছে? শিক্ষা দেওয়া হয় ইংরাজীতে; এবং দেশের দুইচারিজন ছাত্র ঐ শিক্ষা পাইলেও তাহাতে দেশের অন্ন সংস্থানের কোন উপায় হয় না। আরও একটা কথা। সরকারের অধীনে যে সব কাজ, তাহা যতই পণ্ডিত হইয়া বাহির হও না কেন, দেশীয় লোকের ভাগ্যে পড়ে না। ওখানে যাহা শিখান হয় তাহা নাকি আবার শুনিতে পাই খুব ভাল হয় না, কারণ পড়াইবার লোক কই? দেশের দুই এক স্থানে দুই একটা ব্যবহারিক বিদ্যালয়-নামে জিনিস আছে বটে, কিন্তু সামান্য একটু ছুতারের কামারের কাজ বা রেশম তোলা শিখান যদি ব্যবহারিক শিক্ষা বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা হইলে আমরা নাচার। মোট কথা, এদেশে ব্যবহারিক শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই। মেডিকেল কলেজ ও মেডিকেল স্কুল সমূহ ব্যবহারিক শিক্ষালয়ের ভিতর ফেলিব কি? ফেলিলেও আমাদের মতের কোন অন্যথা হয় না; দেখিয়া শুনিয়া ফল হয় যে মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উদ্দেশ্য লোককে উচ্চ ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া নয়, চিকিৎসা ও পূর্ত্তবিভাগে কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী সৃষ্টি করা মাত্র। কথা হইতেছে এই—রীতিমত ব্যবহারিক শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে অজস্র টাকা খরচ করা চাই। কিন্তু আমাদের গভর্ণমেণ্ট শিক্ষার্থে খুব কম টাকাই খরচ করিয়া থাকেন। জাপান, আমেরিকা ও ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজ্য শিক্ষার্থ যে টাকা ব্যয় করেন তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। কোন কোন দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ডে এই বিষয়ে কম টাকা খরচ করা হয় বলিয়া সেখানকার বিজ্ঞগুণী কতই না আন্দোলন করিয়া থাকেন।

(৪) বাঁচিবার অন্যতম আবশ্যক ধন। ইহা আমাদের একরূপ নাই বলিলেই হয়। যাহা কিছু আছে তাহার

অধিকাংশ জমিদারিতে আবদ্ধ। দেশের সকলেরই চেষ্টা কিছু জমি কেনা। যাহার কিছু অর্থ হয় সে অর্থ কিছু বেশী হইলে জমিদারি কিনিবার জন্য, এবং কিছু কম হইলে—জমি কিনিবার জন্য লালাইত। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় কি কুক্ষণেই দেশে জমিদারি প্রথা চলিত হইয়াছিল। অবস্থা এমনি দাঁড়াইয়াছে যে একজন সওদাগরের হাতে বেশী টাকা হইলে তাহা তিনি ব্যবসায়ের উন্নতিতে না লাগাইয়া অনেক সময় জমিদারি কিনিতে লাগাইয়া থাকেন। সকলেরই বিশ্বাস জমিদার হইলে যেমন মান সম্ভ্রম হয় এমন আর কিছুতে হয় না। জমিদারির নীচে হইতেছে কোম্পানীর কাগজ। যে সব ধনশালী লোক জমিদারি বুঝেন না বা উহার ঝঞ্ঝাট পোহাইতে চান না, তাঁহাদের টাকা প্রায় কোম্পানীর কাগজে বদ্ধ। কোম্পানীর কাগজের পর দেশের কিছু টাকা মহাজনিতে খাটে, কিন্তু ইহাতে দেশের ধন বৃদ্ধির বিশেষ সাহায্য হয় না; কারণ, যাঁহারা টাকা ধার লন, তাঁহাদের মধ্যে কম লোকই ঐ টাকা ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োগ করিয়া থাকেন। কেহ যেন মনে না করেন, আমি বলিতেছি দেশে ব্যবসাদার নাই। সামান্য মুদী হইতে বড় সওদাগর পর্য্যন্ত সকলেই ব্যবসাদার, কিন্তু সকল ব্যবসা দেশের ধন বৃদ্ধি করে না। যে সব লোক জিনিষ তৈয়ারি বা উৎপাদনে ব্যাপৃত, কিম্বা যাঁহারা দেশের অতিরিক্ত উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে পাঠাইয়া তথা হইতে সস্তায় দেশের আবশ্যকীয় জিনিষ আমদানী করিতে নিযুক্ত, এবং সেই সব লোক যদি বসন্তের কোকিল না হইয়া প্রকৃত দেশবাসী হন তাহা হইলে তাঁহারাই প্রধানতঃ দেশের ধন বৃদ্ধিতে সাহায্য করেন। কথাগুলি বার্ত্তাশাস্ত্রের অনুসারে ভ্রমপ্রমাদ শূন্য হইল বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু আশা করি আমার উদ্দেশ্য সকলে বুঝিতে পারিবেন। এখন জিজ্ঞাসা করি দেশের কত টাকা ও কয় জন লোক এই রূপ ব্যবসায়ে নিযুক্ত? ধন আগমের অন্য কোন উপায়ও আমাদের নাই। বহির্গমনের উপায় কিন্তু ঢের। গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব প্রভৃতিতে যে টাকা তুলেন, তাহার অধিকাংশ নানা কারণে বিদেশে চলিয়া যায়। সরকারের অধীনে চাকরি করিয়া আমরা দুই দশ জন কিছু পাই বটে, কিন্তু সকল বিভাগের বড় বড় চাকরি সাহেবদের একচেটিয়া। অনেক বিভাগে দেশীয়দের প্রবেশাধিকারই নাই। (ক্রমশঃ)

বীর নারী জিন মেরী গায়েন।

জিন মেরী, ফ্রান্সের অতি সম্ভ্রান্ত ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা মাতা বিলাসিতার ক্রীড়াভূমি পারিস নগরীতে আগমন করিয়া প্রতিভাময়ী দুহিতার সুশিক্ষা বিধানের জন্য ব্যবস্থা করিলেন। পারিস

নগরীতে আগমন মাত্রই সকলে মেরির দেবীনিন্দিত সৌন্দর্য্য, বিনয়নম্র চরিত্র ও আশ্চর্য্য প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। এত অল্পবয়স্কা বালিকার পক্ষে অজস্র প্রশংসা বিষময়ফলে পরিণত হইল। অত্যল্পদিনেই শৈশবের ধর্ম্মানুরাগ তাঁহার হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়া গেল। দৈনিক প্রার্থনা পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়া গেলেন। ১৬ বৎসর বয়সে অস্ফুট প্রতিভাময়ী বালিকার আনন্দপূর্ণ জীবনের ভীষণ কুজ্ঝটিকাপূর্ণ নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। কাউন্ট গায়েন নামক অতুল ধনশালী একজন ভয়ানক দুষ্ক্রিয়াসক্ত লোকের সহিত তাহার পরিণয় স্থির হইয়া গেল। ধন ভিন্ন এই পাত্রের এমন একটীও গুণ ছিল না, যাহাতে প্রতিভাময়ী পরমসৌন্দর্য্যশালিনী মেরীর সম্মুখে সে দণ্ডায়মান হইতেও সমর্থ। ভাবী পত্নী হইতে সে অন্ততঃ ২২ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল। যে সভ্য দেশের মহিলাকুল স্বাধীনতার সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহিতা, সেই দেশেও বিবাহের মাত্র ৩ দিন পূর্ব্বে ভাবী পতি সন্দর্শন তাঁহার ভীষণ অন্ধকারপূর্ণ অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল। এই পরিণয় সর্ব্ব প্রকারে মেরী গায়েনের অসহ্য ও অবর্ণনীয় ক্লেশদায়ক হইয়াছিল। তাঁহার লিখিত আত্মজীবনীই তাহার সাক্ষ্য দেয়। রূপ গুণ সকলই বৃথা গেল। বিবাহ মেরীর মহা-যন্ত্রণাময়ী জীবনের সূচনা হইল বলিয়া সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। মেরীর পিতার ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল, অতুল ধনশালী লোক ভিন্ন কদাপি কন্যার বিবাহ দিবেন না। গায়েনের ও পবিত্র পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল,—পরম সৌন্দর্য্যশালিনী পত্নী লাভ। শ্বশুর ও জামাতার কামনা পরিপূর্ণ হইল, কিন্তু এই-রূপ বিবাহের অবশ্যম্ভাবী যে বিষময় ফল তাহাই ফলিল। নববিবাহিতা মেরী জীবনের নব পরিচ্ছেদ আরম্ভাবধি একটী দিনও দাম্পত্য জীবনের পবিত্র প্রসন্ন মুখ দর্শন করেন নাই। বয়োজ্যেষ্ঠ গায়েন ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক বাতরোগে সর্ব্বদা শয্যা-শায়ী থাকিতেন। প্রথম প্রথম মেরীর প্রতি বাহিক প্রেম জানাইতে সে ব্যগ্র থাকিত। গায়েনের জননী দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি ছিলেন, পুত্রের প্রকৃতি তাঁহারই প্রকৃতির ছাঁচে গঠিত হইয়াছিল। বিবাহের মুহূর্ত্ত হইতে শাশুড়ী এমন অতুল রূপগুণবতী বালিকাবধূকে বিষদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। এইরূপ পাষাণগঠিতা, কোপনস্বভাবা স্ত্রীলোক ফ্রান্সের ন্যায় স্থানেও বাস্তবিক দর্শনযোগ্য ছিল। পুত্রের নিকট অনুক্ষণ বধূ সম্বন্ধে অমূলক ভীষণ কুৎসা কীর্ত্তন তাহার দৈনিক জীবনের একমাত্র কার্য্য ছিল। মেরী গায়েনের দুর্গতির সীমা ছিল না। তিনি নিজ দুঃখ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। পিতৃগৃহে আমি যেমন সকলের নয়ন-মণি ছিলাম এখানে তেমনি আমি সকলেরই চক্ষুঃশূল। নিশি দিন আমার প্রতি অবিশ্রান্ত ধারায় শুধু তিরস্কার, অশ্রাব্য কুৎসাকীর্ত্তন ও ভীষণ লাঞ্ছনা বর্ষণ হয়। হায়! কর্ণ

বধির হইল না কেন? অন্তরের মর্ম্মস্থল, দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা দগ্ধ। কঠোর যাতনায় মন প্রাণ অধীর। মৃত্যুকে দিবানিশি ডাকিতেছি। কাতর কণ্ঠে অনুক্ষণ প্রার্থনা করি "হে প্রভো! ভীষণ ক্লেশে পেষিতা এ অধম কন্যাকে তোমার নিকট উঠাইয়া লও" কিন্তু এই কাতর ধ্বনি প্রভুর কর্ণে পঁহুছেনা। আমি নীরব ব্রত ধারণ করিয়াও লাঞ্ছনা হইতে নিষ্কৃতি পাই না। হঠাৎ যদি অবর্ণনীয় ক্লেশে পীড়িত মুখের হৃদয় হইতে একটা কথাও বাহির হয় অমনি সকলে ভীষণ ভ্রূকুটী করিয়া বলে বিবাদ বাধানই আমার হীন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য! যে স্বামী সংসারে স্ত্রীর একমাত্র স্নিগ্ধতাপূর্ণ ছায়া, হৃদয়ের সর্ব্বপ্রকার জ্বালা জুড়াইবার স্থান, আমার এমনি দুর্দ্দশা যে মৃত্যুশয্যাশায়ী স্বামী, অক্লান্তভাবে যাহার রোগে আমি দিবানিশি সেবা করিয়াছি, তিনি ভ্রমেও একটীও ভালবাসা, স্নেহ, কি সহানুভূতির কথা বলা দূরে থাকুক, সর্ব্বাগ্রে দলবলের সমক্ষে আমায় যে ভীষণভাবে নির্য্যাতন করেন তাহা যথার্থই অবর্ণনীয়। পিতা ও মাতা যেমনি উচ্চ বংশজ, স্বামী তেমনি নীচের চূড়ান্ত। যেমন বাহিরে তেমনি অভ্যন্তরে। আমায় অপমানিত করিবার জন্য ভয়ানক নীচ ও দুষ্ক্রিয়াশীল বেতনভুক্ লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহাদের সন্নিধানেই অনুক্ষণ বাস করিতে হয়। পিতা মাতাকে আমি কদাপি এই ভীষণ দুর্গতির কাহিনী জানাই নাই, তথাপি তাঁহারা লোকমুখে ইহা শুনিয়া ঐ লোকদিগকে দেখামাত্রেই আমি মান মর্য্যাদা রক্ষণে একবারেই অশক্ত ইত্যাদি বলিয়া কঠোর তিরস্কার করিয়া গেলেন। পাঠক একবার কল্পনাচক্ষে দর্শন করুন, মেরীর জীবন কি অবর্ণনীয় যন্ত্রণাময় ও অন্ধকারপূর্ণ। এই সময়েও মেরী চরিত্রের যে অত্যাশ্চর্য্য বিরল মহান্ সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই সুরবালারই উপযুক্ত বটে। ঐ স্বাধীনতাপ্রধান রাজ্যে বর্দ্ধিতা, ধনমর্য্যাদাশালী বংশজাতা ও আদরিণী ১৬ বৎসরের কোমলা বালা নরকসদৃশ স্বামীগৃহে নীচতম কার্য্য স্বহস্তে নির্ব্বাহপূর্ব্বক কর্ত্তব্যশীলতা ও ধীরতার যে অত্যাশ্চার্য্য দৃষ্টান্ত জগতে দেখাইয়া গিয়াছেন, ভারতমহিলাকুল! বল ত, তোমরা কয়জন ঐ বীরনারীর সমস্থানীয়া? ভগবানের বিশেষ আশীর্ব্বাদে একটী ধার্ম্মিকা মহিলার সহিত এই সময়ে তিনি হঠাৎ পরিচিতা হইলেন। তাঁহার পরীক্ষা বহন জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা প্রথম দর্শনেই ঐ নারী বুঝিয়া লইলেন এবং মেরীকে বলিলেন,—"ভগ্নি! বিশ্বাসবিহীন অনুষ্ঠানের সাহায্যে কি স্বর্গের বল ও শান্তিলাভ সম্ভব, তুমি অন্তরে তাঁহাকে, না পাইয়া নিরন্তর বাহিরেই অন্বেষণ করিতেছ, তাই এত অশান্তি ও নিরাশা। এখন হইতে তুমি একান্ত মনে হৃদয়ের অন্তরালে প্রভুর দর্শন যাহাতে পাও সেই মহাসাধনায় প্রবৃত্ত হও। এই কথা কয়টী শুনিবামাত্র মেডম গায়েনের জ্ঞাননেত্র খুলিয়া গেল। মোহান্ধ-

কার অপসারিত হইল। কেবল অনুষ্ঠানের সাহায্যে ঈশ্বরদর্শনের চেষ্টায় এতকাল ব্যস্ত থাকিয়াও কেন প্রভুর জীবন্ত সত্ত্বা উপলব্ধি জনিত অচল শান্তি অসম্ভব, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ঐ দুর্গতিপূর্ণ জীবনের সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইলেন। সেই মুহূর্ত্তেই ঐ ধার্ম্মিকা মহিলাকে পত্র লিখিলেন, "তোমার অতি সারবান্ কয়টী কথার বলে আমার অসহ্য জীবনের সকল অন্ধকার, জ্বালা, যন্ত্রণা, অশান্তির অগ্নি সুদূরে পলায়ন করিয়াছে! ভগ্নি! কি অমূল্য ধন হস্তে পাইয়াছি। যাঁহাকে পাইয়াও শুধু জ্ঞানালোকের অভাবে ধরিতে এতকাল অসমর্থ ছিলাম, তিনি দয়া দিয়া সকল যন্ত্রণায় শান্তিসুধার মহাধারা বর্ষণপূর্ব্বক মর্ম্মস্থলের অবর্ণনীয় যাতনা একবারে মুছাইয়া দিয়া হৃদয় শান্তিপূর্ণ করিয়াছেন। হে প্রভো! তুমি ত এত দুঃখে আমায় ধরিয়াই রাখিয়াছিলে। হায়!" আমি তোমার অন্বেষণে এতকাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবসন্ন হইয়াছি। অথচ তুমি ত অন্তরতম স্থানে অনুক্ষণ বাস করিতেছ। আমি সুধাসাগরতীরে বসিয়াও কি দারুণ তৃষায় ব্যাকুল ছিলাম। আজ ঘোর অন্ধকারপূর্ণ জীবনে নব উষার জ্যোতি ফুটিল।

ভেক গাথা।

ভাগ্যহীন তুমি ভেকরাজ!
লোকে বলে এ জগতে নাহি তব কাজ!
অতি হেয় ঘৃণ্য দীন,
তুমি ভেক বুদ্ধিহীন,
বিল খাদ তড়াগেতে তব বাসস্থান;
কর্দ্দমাক্ত জল নাকি কর তুমি পান!
মন্দভাগ্য ভীরু অতি
তুমি ভেক, মন্দমতি,
কুসঙ্গ-কলুষে তব লোকে পায় ব্যথা;
নানা মতে নানা লোকে বলে নানা কথা।
আমি কি নয়নে ভেক! দেখি হে তোমায়,
বলিতে সরেনা মুখে—ভাষা না যুয়ায়।
তুমি ভেক, মহাযোগী,
নহ সংসারের ভোগী,
নিষ্ঠা বিষ্ঠা তুল্য তব—নাহিক বিকার;
সুখে দুখে ভেদ তাই, নাহিক তোমার।
পড়ে থাক নদীকূলে,
কিম্বা কোন তরুমূলে,
শীত গ্রীষ্মে কিছুমাত্র নাহি তব ভয়;
সহিতে জনম তব, তাই এত সয়!
করিতে আশ্রয় দান,
তোমার কোমল প্রাণ,
কেঁদে কেঁদে উঠে ভেক, ধর তাই "ছাতা"
ক্ষুদ্র জীব পশে তায়—হেরি শয্যা পাতা।
লম্ফে লম্ফে গতি তব,—
রঙ্গ ভঙ্গ কত কব,
সে সবে বুঝাও জীবে যে স্বাধীন মতি,
উরগের মত কভু নহে তার গতি।

নিষ্ঠুর, ক্রীড়ার ছলে
হিংসা যদি করে বলে,
ঊর্দ্ধমুখে কর তবে শুধু ঈশ-নাম ;
সে নাম লইয়া মুখে ছাড় ভবধাম।
গগনেতে ঘনঘটা
ছড়ালে বিদ্যুৎছটা
গম্ভীর নির্ঘোষে তুমি জানাও বারতা,
আনন্দ-সংবাদে হাসে তরু-গুল্ম-লতা।
মেঘ-গুরু-গরজন,
শুনে হও প্রীতমন,
প্রতিদানে গাও তুমি হয়ে আত্মহারা ;
দ্রবময়ী সে সঙ্গীতে ঝরে বারিধারা।
সে বারিতে বসুমতী,
হয় শস্যশালী অতি,
সেই শস্যে কোটি জীব পেতেছে আহার ;
তবু লোকে নিন্দাবাদ করিবে তোমার।
লোকে বলে নাহি রূপ,
তুমি কদাকার-স্তূপ,
কবি বলে গুণী যেই—গুণে তার কাজ,
নির্গুণ শিমুল ফুল ধরে নানা সাজ।
ব্যাংএর আধুলি খানি
প্রবাদের মত মানি,
স্বত্ববান্ হয়েছিল কিন্তু প্রাণী আর,
এতেও কি ঘুচিবে না কলঙ্ক তোমার ?
হায় হায় পোড়া লোক,
তোমাদের গেছে চোক,
ভাল মন্দ বিচারের নাহি কোন জ্ঞান,
বুঝনা বুঝনা ভেক কি মহৎ প্রাণ!
যে যা বলে সব সব,
যত দিন ভবে রব,
মনের আনন্দে গাব ভেকরাজ-গাথা ;
পাগল বলিলে লোকে নাহি পাব ব্যথা।
ভেক, মম এই সাধ,
যারা করে নিন্দাবাদ,
তাহাদের শুনাইও সঙ্গীত তোমার,
যেমন তাদের কর্ম্ম—তেমন বিচার!!!

জ্ঞানদা ও প্রমোদার কথোপকথন!

প্র। তুমি না ভাই জ্ঞানদা সে দিন বলেছিলে যে, সংসার সম্বন্ধে আমার মনে যখন যে সন্দেহ হবে তোমার কাছে বলিলে তাহার মীমাংসা করিয়া দিবে, আরও বলেছিলে সমাজ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বেশ পরিষ্কার হ'লে তারপর ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু উপদেশ দেবে।

জ্ঞা। তাত বলেইছিলাম, তাকি অস্বীকার করছি? এখন আমার একটু অবসর আছে, তোমার মনে যদি কোনও সন্দেহ থাকে ত বল্‌তে পার।

প্র। তোমার ত অবসর খুঁজেই পাই না। তবে কি ভাগ্যি আজ তোমার একটু অবসর হয়েছে। আজ কদিন থেকে প্রায় মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে দেখি, তা তোমার ত অবসর কখন হয় তা বুঝতে পারি না।

জ্ঞা। তোমার ত আর আমাদের মত সংসারের কাজ কর্ম্ম নাই। সমস্ত দিন পাঁচ রকম আমোদ প্রমোদ নিয়েই আছ। তোমার প্রমোদা নামটী বেশ, সার্থক হয়েছে।

প্র। কেন, মানুষের নামের আবার একটা অর্থ আছে নাকি?

জ্ঞা। তা বুঝি জাননা? অনেক সময় নামেতে ও রাশিতে এমন মিল হ'তে দেখা যায়—যে, মানুষ ঠিক্ তাহার নামের মত কাজ করিয়া থাকে। কখনও কখনও "দীনবন্ধু" নামের লোককে বাস্তবিকই "দীনবন্ধু" হইতে দেখা যায়। অপর পক্ষে আবার কোটিপতির পুত্রের নাম কাঙ্গালী চরণ কিম্বা দুঃখীরাম রাখা হইল। ঘটনাক্রমে দেখা গেল, সেই লোক জীবনে বাস্তবিকই যথেষ্ট দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ করিল। এই দেখ না কেন তোমার নাম প্রমোদা—আমি উহার কি অর্থ করি জান—প্রমোদা প্রমোদপরায়ণা অর্থাৎ যে নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পাঁচ প্রকার বৃথা আমোদ প্রমোদে সময় অতিবাহিত করে।

প্র। কেন আমোদ প্রমোদ কি কাযের মধ্যে নহে?

জ্ঞা। দেখ প্রমোদা! তোমাকে ছোট ভগ্নীর মত স্নেহ করি ও ভালবাসি। সেই জন্য কিছু উপদেশ দিবারও অধিকার রাখি। তা না হ'লে বাস্তবিকই আমার কতটুকুই বা জ্ঞান এবং উপদেশ দিবার কি শক্তিই বা আছে? তোমার ভালর জন্য তোমাকে দুটী কথা বলিব, তাহাতে যদি অপ্রিয় বলিতে হয় অথবা তোমার মঙ্গলের জন্য নিজের যদি কিছু প্রশংসা করিতে হয়, সেজন্য কিছু মনে করো না। কার্য্যের কথা যদি বলিলে, তবে কাজ কাহাকে বলে শুন। স্বভাবের ভিতর নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীতে অনেক সময় সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার কর্ম্মতত্ত্বের আভাস দিয়াছেন। এই দেখনা কেন, পশু পক্ষী প্রভৃতির ভিতরে পুরুষগুলি অপেক্ষাকৃত অধিকতর সাহসের ও শক্তির ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করিয়া থাকে; স্ত্রীরা সন্তানাদি প্রতিপালন প্রভৃতি গৃহ-নিবদ্ধ কার্যে ব্যাপৃত থাকে। আমার মনে হয়, আমাদিগের ভিতর এইরূপ কার্য্যের একটা শৃঙ্খলা থাকা প্রয়োজন।

প্র। আচ্ছা স্ত্রীলোকের কার্য্য তোমার মতে কি হওয়া উচিত?

জ্ঞা। স্ত্রীলোক বলিতে যদি "স্ত্রী" বুঝ, তবে তাহার যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য আছে বলিয়া আমি বিবেচনা করি, তাহার বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতেছি।

প্র। তুমি দেখিতেছি আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া কিছু ব'লবে মনে করিতেছ।

জ্ঞা। প্রয়োজন হলে বল্‌তে পারি। দেখ! সংসারের সুখ, দুঃখ, শান্তি-অশান্তি স্ত্রীর চরিত্র ও ব্যবহারের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। আমার বিবেচনায় প্রত্যেক স্ত্রী অথবা গৃহকর্ত্রীর অতিপ্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা উচিত।

প্র। তুমি বুঝি "ভগবানের উপাসনার' কথা বল্‌ছ?

জ্ঞা। না প্রমোদা! উপাসনা নয়, প্রার্থনা। আর উপাসনার বিষয় তুমি যাহা বুঝেছ এবং ভগবানের উপর তোমার যতদূর

ভক্তি আছে, তা এক কথাতেই বুঝতে পেরেছি। ভগবানের মহিমা বর্ণন, তাঁহার বিভূতি প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাতে তন্ময় হইয়া যাওয়া, সে অনেক দূরের কথা। প্রথমতঃ সরল প্রাণে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা করা উচিত।

প্র। তা প্রার্থনার কথা কি বল্‌ছিলে বল।

জ্ঞা। প্রত্যেক গৃহিণীরই প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে ভগবৎচরণে গৃহবাসী সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা উচিত। যে গৃহের সকল কার্য্যের ব্যবস্থার ভার আমার উপর ন্যস্ত আছে, তাহার কঠোর দায়িত্ব আমার শক্তিতে বহন করা অসম্ভব। ইহা বিশেষরূপে অনুভব করা চাই, এবং অনুভব করিয়া সেই মহাশক্তিশালী শক্তিপ্রস্রবণের নিকট শক্তি ভিক্ষা করিয়া তাঁহার কৃপায় আমি অক্লেশে সংসারের এই গুরুভার বহন করিতে সক্ষম হইব।

প্র। তোমার কথায় ভাই যেন বোধ হইতেছে,—সংসার তোমার নিজের নয়; উহা অপর এক জনের, যে কেবল তোমাকে উহার দায়িত্ব বহনের ভার দিয়াছে।

জ্ঞা। দেখ প্রমোদা! এ প্রশ্নের উত্তর তুমি এক্ষণে ভাল বুঝিতে পারিবে না। ইহা ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, সংসারতত্ত্বের পর ধর্ম্মতত্ত্বের বিষয় আলোচনা করা যাইবে। এক্ষণে প্রার্থনার বিষয় যাহা বলিতেছিলাম শুন।

প্র। বল! শুনিতেছি।

জ্ঞা। ষোল আনা সংসারের দায়িত্ববোধ না থাকিলে কেহ কখনও সুগৃহিণী হইতে পারে না। আমার শক্তির উপর, আমার বুদ্ধি, বিবেচনা ও বিচক্ষণতার উপর এই গৃহবাসী সকলের সুখ শান্তি অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে, ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে এবং নিজের শক্তির উপর অত্যধিক বিশ্বাস না থাকিলে, প্রার্থনা আপনা আপনি প্রাণ হইতে বাহির হইয়া আইসে। যেমন তুফানের সময় নদীবক্ষে নৌকারোহী সন্তরণাক্ষম ব্যক্তির পক্ষে নিজ প্রাণ রক্ষার জন্য প্রার্থনা করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রথমে ভগবানের চরণে সকলের মঙ্গল ও কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া পরে আপনার তৎসাধনোপযোগী ইচ্ছা ও শক্তির জন্য প্রার্থনা করিব। বিগত রজনীতে সকলে যে নিরাপদে তাঁহার মাতৃ ক্রোড়ে শায়িত হইয়া নিদ্রায় অচেতন থাকিয়াও এত দীর্ঘ সময় যে নিরাপদে অতিবাহিত করিলাম, তাহার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতাভরে তাঁহার উদ্দেশে মস্তক অবনত করিব। তৎপরে ভক্তিভরে সেই গৃহদেবতার চরণ বন্দনা করিয়া এবং গৃহবাসী সকল গুরুজনের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব।

প্র। তোমার প্রার্থনা, প্রণাম, নমস্কার প্রভৃতির পালা যেরূপ লম্বা, তাহাতে এই সকল কর্ম্মেই যে বেলা ৮টা বাজিয়া যাইবে।

জ্ঞা। তোমার মত বেলা ৭ টার শয্যা

ত্যাগ করিলে বেলা ৮ টা কেন ১০ টা বাজিয়া যাইবে তাহাতে বিচিত্র কি? কিন্তু ভেবে দেখ! যদি রাত্রি ৪ টার সময় শয্যা ত্যাগ করা যায়, তবে কতক্ষণে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে! বিশেষতঃ যাহা দৈনিক অভ্যাস্ত ব্যাপার, তাহা সহজভাবে অল্প সময়েই সমাধা হইতে পারে। আরও ভাবিয়া দেখ! এই সকল পবিত্র ক্রিয়ার পক্ষে প্রভাতের নীরবতা ও স্নিগ্ধতা অতিশয় অনুকূল।

প্র। তা ভাই! ৭ টার সময় যে উঠি, তাতে আমার অপরাধ কি? বেহারাটা তখনও চা প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারে না।

জ্ঞা। বুঝছি। চা না খেলে তোমার বুঝি ভাল ক'রে ঘুম ভাঙ্গেনা, আর প্রার্থনা করা ত একেবারেই অসম্ভব। আজ কাল চা এর সঙ্গে উপাসনার নিত্যসম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখিতে পাই প্রথমে না হয় পশ্চাতে চা থাকিবেই, তা না হইলে মেজাজ একেবারে বেঠিক্ হইয়া যাইবে। তা মন্দ নয়—চা খেয়ে শরীর একটু তাজা করে নিয়ে প্রার্থনা করাটা মন্দ নয়।

প্র। কেন ভাই! ছেলে বেলায় পিসিমার কাছে শুনেছি, খালি পেটে থাকিলে অসুখ করে, সেই জন্য কিছু খেয়ে নিয়ে কাজে লাগা ভাল নয় কি?

জ্ঞা। চুপ কর ভাই! আর বলিস না। পিসিমার কাছে শোনা গল্প সবগুলিই কি বিশ্বাস করিয়াছ, না সেই মত কার্য্য করিয়া থাক। কত রাক্ষস, রাক্ষসীর, ভূত প্রেতিনীর গল্প শুনিয়াছ, সে গুলিও কি ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাক। যাক সে কথা—এখন যা বলি তাই শোন।

প্র। তুমি অত যত্ন নিয়ে কথাগুলি বল্‌ছো, আমি আর বসে বসে কাণ দিয়ে শুনতে পার্‌বো না?

জ্ঞা। না প্রমোদা, এ সকল ঠাট্টা নয়, এ কার্য্যগুলিকে সাধারণতঃ লোকে সংসারের অতি ক্ষুদ্র কার্য্য বলিলেও আমি এ গুলিকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করি। সুতরাং এ সকল বিষয় লইয়া হাস্য পরিহাস করিতে আমি নিতান্ত অনিচ্ছুক জানিবে। যদি এ সকল কথায় তোমার কোনও উপকার হয় মনে কর তবে আমি বল্‌তে প্রস্তুত আছি। নচেৎ নহি।

প্র। রাগ কর কেন ভাই! ভাল না লাগলে আমি কি এমন বৈকাল বেলায় ঘণ্টা পিয়ানো না বাজাইয়া তোমার কাছে ছুটিয়া আসি?

জ্ঞা। পিয়ানো আবার কবে হ'লো?

প্র। তা বুঝি জাননা? সেদিন আমি জেদ্ করে বল্লেম যে, হারমোনিয়ামটা একেবারেই ভাল নয়, তাহার পরিবর্ত্তে একটা ভাল পিয়ানো চাই। তা তিনি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে, "দেখা যাক্" বলে চলে গেলেন। তার পরে ৩৫০৲ টাকা দিয়ে এই পিয়ানোটী এনে দিয়াছেন।

জ্ঞা। ভাল, শুনে সুখী হলেম যে তুমি অতগুলো টাকা জমিয়ে স্বামীর হাতে দিতে পেরেছ।

প্র। তা কেন? তাঁর হাতে ১০০৲ টাকা ছিল, বাকি টাকা বোধ হয় ধার ক'রে নিয়েছেন।

জ্ঞা। বটে! বোধ হয় ধার ক'রে। সেটা ঠিক্ জাননা!—জানিবার প্রয়োজনও বোধ হয় দেখ নাই। জিনিষ পেলেই হ'ল, কোথা হ'তে কি উপায়ে আসিল তাহা আর দেখিবার প্রয়োজন কি? "সিদ্ধে কার্য্যে সমং ফলম্।"

প্র। তুমি ভাই! কথায় ফেরে যাহোক্ খুব বলে নিচ্ছ।

জ্ঞা। বল্‌বার মত কাজ কল্লেই বল্‌তে হয়। আমি না বলি অপর একজন বলিবে! কেহ না দেখে, কেহ কিছু না বলে, তোমার ব্যবহার ও বিবেচনায় ফল সময়ে তোমার সংসার-তরুতে ফলিবেই ফলিবে। তোমাদের পারিবারিক সুখ সমৃদ্ধি দেখিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা কাহারও অবিদিত থাকিবে না। যাক্ সে কথা—যাহা বলিতেছিলাম, সংসারের দ্বিতীয় কর্ম্ম এই যে, গৃহে যদি কোনও রোগী, শিশু, আতুর বা অক্ষম ব্যক্তি থাকে, তবে তাহাদের ব্যবস্থা করা এবং সকলের বিধিমতে পথ্যাদির বন্দোবস্ত করা। তৃতীয় কর্ম্ম স্বহস্তে অথবা দাস-দাসীর দ্বারা গৃহাদি পরিষ্কার করা এবং তৎপরেই সাধারণের আহারাদির ব্যবস্থা করা বিধেয় এবং সকলের আহারাদি উপযুক্তরূপে সমাধা হইল কিনা তাহাও পরিদর্শন করা উচিত।

প্র। তোমার ব্যবস্থামতে গৃহিণীর নিজের আহারটী দেখিতেছি সর্ব্বপশ্চাতে পড়িল।

জ্ঞা। অগ্রে হইবার ব্যবস্থা কোনও দিন ছিলনা ও কোনও দিন হওয়াও উচিত নহে। তুমি গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা, জননীরূপিণী হইয়া কি করিয়া গৃহের একটী প্রাণী অভুক্ত থাকিতে নিজে ভোজন করিতে পার? বাটীস্থ সকলের আহার হইলে তোমারদেখা উচিত কোনও অজানিত অতিথি অভ্যাগত অথবা তোমাদের মুখাপেক্ষী হইয়া অন্নের প্রত্যাশায় কেহ উপস্থিত আছে কিনা? যদি থাকে তবে গৃহের মঙ্গলার্থ তাহারও বিধিমত পরিচর্য্যা করা উচিত। এমন কি গৃহপালিত পশুপক্ষীদিগের প্রতিও যেন ত্রুটী না হয়। তৎপরে নিজে যে ভোজন করা যায় তাহা শীতল কদন্ন হইলেও সুস্বাদু পলান্নের অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে।

প্র। তুমি তাহলে নিত্য পলাও খাও দেখ্‌ছি।

জ্ঞা। অংশু একবার সেই উপাদেয় অন্নের আস্বাদন পাইলে কেহই আর তাহা ত্যাগ করিতে পারিবে না।

প্র। আহারান্তে কার্য্যের কিরূপ ব্যবস্থা তাহা জানিতে বড়ই উৎসুক হইতেছি।

জ্ঞা। অবশ্য একটু নিদ্রা দিবার ব্যবস্থা আমি কখনই করিব না, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ। কারণ, দিবানিদ্রা যে স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি করে এবং শরী-

রকে একেবারে জড় করিয়া তোলে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আহারের পর সাংসারিক এমন কতক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য আছে, যাহা সে সময়ে না করিলে আর সমস্ত দিবসে হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

প্র। যথা?

জ্ঞা।—যথা—ঘর দ্বার প্রভৃতি পরিষ্কার করা, শয্যাদি রচনা। বালকবালিকাদিগের বৈকালিক আহারের ব্যবস্থা প্রভৃতি। তুমি হয়ত বলিবে এগুলি দাসদাসী এবং পাচক প্রভৃতির কায।

প্র। আমিত তাই মনে করি।

জ্ঞা। তা নয়, ওটী তোমার ভ্রম। ঐ সকল কার্য্য স্বহস্তে সম্পন্ন করিলে হৃদয়ে যে আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়া যায়, অপরে করিলে তাহা কখনই হইতে পারে না। তোমার সংসারের কার্য্য তুমি না করিলে, না দেখিলে, তাহাতে যে আনন্দ তাহা তুমি নিজে উপভোগ করিতে পারিলেনা, অপর পক্ষে বেতনভোগী লোকে কর্ত্তব্যের অনুরোধে কার্য্যগুলি করিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কোনও আনন্দ অথবা শান্তি নাই। কাযেই সংসারের যে সুখ তুমি স্বেচ্ছায় উপভোগ না করিয়া অপরের উপর ভার দিলে, তাহারাও তাহা উপভোগ করিতে পারিল না।

প্র। তুমি ভাই! মিষ্টি করে বেশ দু চার কথা শুনাচ্ছ।

জ্ঞা। আমি ত ভাই! পূর্ব্বেই বলেছি যে, রাগ করলে চল্‌বে না। একটু ঘা দিয়ে কথা গুলো না বসালে হৃদয়ে স্থায়ী ভাবে বস্‌বে কেন?

প্র। তোমার কথাগুলি হৃদয়ে যে ভাবে বসছে তা যে আর কখনও ভুলবো এমন মনে হয় না।

জ্ঞা। আমিও তো তাই চাই।

প্র। হ্যাঁ ভাই জ্ঞানদা, তুমি একটী কথা বলতে একেবারেই ভুলে গিয়েছ।

জ্ঞা। বুঝেছি—ভুলি নাই—বলি নাই কেন শুন্‌বে সর্ব্ব কার্য্যেষু মাধবঃ।

প্র। তা কোন কার্য্যেই ত নামটী মাত্র করলে না।

জ্ঞা। নাম করলেইত সাধারণ হ'য়ে গেল, জিনিষটা যে অসাধারণ। যেমন সকল কার্য্যের প্রারম্ভে সিদ্ধিদাতা শ্রীহরিকে স্মরণ করিবে—সেইরূপ সংসারধর্ম্মের সকল কার্য্যই স্বামীকে লইয়া। তাঁহার সন্তোষ ও তৃপ্তি কল্পনা না করিয়া তুমি সংসারের কোনও কার্য্য করিতে পার না। যদি কর তবে তাহার ফল শুভ নহে। সংসার ধর্ম্মের এইটী প্রধান সূত্র ও মূল মন্ত্র ইহা মনে রাখিবে।

প্র। সাধ্যমত তোমার প্রদত্ত মন্ত্র জপ করিব।

জ্ঞা। তুমি তবে এখন কিছুক্ষণ জপ করিতে থাক; আমার কিছু কায আছে, এখন উঠলেম।

প্র। আমিও তবে চল্লেম—দেখি তোমার কথামত কত দূর কার্য্য ক'রতে পারি। সময়ান্তরে আরও অনেক বিষয় শুনিবার ইচ্ছা রহিল।

ভগবান্ ভক্তের অধীন।

প্রেমিক ভক্তের অসাধ্য কি সংসারে।
সে যে হাতে পেয়ে ত্রিলোকের নাথ যা
মনে লয় তাই করে।

ভগবান্ ভক্তের অধীন, সচরাচর একথা শুনিতে পাওয়া যায়। উপরে যে একটী সঙ্গীতের অংশ প্রদত্ত হইল, তাহাও এই প্রচলিত বাক্যের সমর্থন করিতেছে। এজন্য "ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু" ভগবানের একটী নাম। যদি একথাই মানিয়া লইতে হয় তাহা হইলে ভক্তদিগের জীবনেতিবৃত্ত দুঃখময় ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ দেখিতে পাই কেন? ধর্ম্মবীর শাক্য সিংহকে তীর্থঙ্কর সন্ন্যাসীদিগের হস্তে কত নিগ্রহ পাইতে হইয়াছিল, ভক্তশ্রেষ্ঠ চৈতন্য দেবকে তাৎকালীন নবদ্বীপের শাক্তগণ কত লাঞ্ছনা করিয়াছিলেন! বিশ্বাসীদিগের অগ্রণী যীশু স্ববংশীয় ইহুদিজাতির ষড়যন্ত্রে ক্রুশ কাষ্ঠে অম্লান চিত্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ধর্ম্মপ্রাণ মহম্মদ স্বজাতীয় বিডুইনদিগের উৎপীড়নে অস্থির হইয়া জন্মভূমি মক্কা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হয় বল, ইঁহাদের কেহই ভক্ত ছিলেন না, না হয় বল, ভগবান্ ভক্তবৎসল নহেন। যদি তাহাই হইবেন তবে এই সকল ভক্ত এরূপ দুর্বিষহ যাতনা পাইলেন কেন! তাঁহারা কি দুঃখে পড়িয়া তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হয়েন নাই? ভগবানের শরণাপন্ন হইলে তিনি নিষ্ক্রিয় রহিলেন কেন? তিনি যখন ভক্তের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, তখন তাঁহাদের দুঃখের সময় উদাসীন থাকিয়া তাঁহাদিগকে তাদৃশভাবে নিপীড়িত হইতে দিলেন কেন? তাঁহার স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই ভক্তদিগকে রক্ষা করা উচিত ছিল। তাহা করেন নাই, ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে ভগবান্ ভক্তের অধীন নহেন।

সূক্ষ্মরূপে বিচার করিতে গেলে বলিতে হইবে, ভক্তই ভগবানের অধীন এবং ভগবানের ষোল আনা অধীনতা স্বীকার না করিলে কেহ ভক্ত আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। যখন ভক্ত এইরূপ অবস্থায় উপনীত হয়েন, তখন তাঁহার নিজের কোন ইচ্ছা থাকে না। ভগবানের ইচ্ছাই তখন তাহার মধ্য দিয়া কাজ করে। এজন্য বৈষ্ণবশাস্ত্রে এক স্থলে লিখিত আছে,—"রাধা কৃষ্ণ দোঁহে মিলি হয় এক জন। এক আত্মা দুই বপু লীলার কারণ।" এ স্থলে রাধা শব্দে আরাধনাকারী ভক্ত এবং কৃষ্ণ শব্দে আকর্ষণকারী ভগবান্ বুঝাইতেছে। সাধনের চরম সীমায় উভয়ের দেহগত পার্থক্য থাকিলেও আত্মাগত কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে না। তখন ভক্তের জীবনে যাহা কিছু ঘটিতে থাকে, তাহাই তিনি ভগবানের ইচ্ছানুমোদিত মনে করেন এবং তাহা দুঃখজনক হইলে অক্ষুব্ধ চিত্তে সহ করিয়া যান এবং সুখকর হইলে উৎফুল্ল

হয়েন না সাধারণ মনুষ্যেরা ভক্তদিগের এই জীবনরহস্য সহজে অনুভব করিতে পারে না। তাহারা নিজ নিজ জীবনের আদর্শ লইয়া ভক্তদিগের জীবন পরিমাপ করিতে যাইয়াই বিষম গোলে পড়ে। তাহারা যেমন দুঃখকে ভয়ের চোখে দেখে ও সুখকে সাদরে আলিঙ্গন করিতে যায়, ভক্তগণও তাহা করিয়া থাকেন, এই সিদ্ধান্ত করিয়া ভক্তদিগের জীবনের দুঃখের আধিক্যের সামঞ্জস্য করিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং ভক্ত যাহা মনে করে তাহাই করিতে পারেন, এ কথার সত্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয় না। কিন্তু ভক্তের মন যে পরিবর্ত্তিত হয়, তিনি যে সাধারণ মানবীয় মনের প্রকৃতি অতিক্রম করিয়া উঠেন, সুতরাং তাঁহার মনে সাধারণ মানুষের ন্যায় যাহা, তাহা আসিবে না, একমাত্র ভগবানের ইচ্ছানুমোদিত যাহা, তাহাই আসিবে, কাজেই তাহা পূর্ণ হইবে। তাই বলি, ভক্ত যাহা মনে করে তাহাই করিতে পারে একথা ষোল আনা সত্য। তাই বাহিরের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে বলিতে পারা যায় যে, ভগবান্ ভক্তের অধীন। যতদিন ভক্ত হইতে না পারিব, ততদিন অনেক ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে, কারণ মানব-মন সাধারণতঃ ভগবানকে অতিক্রম করিয়া চলে। কাজেই বলিতে হয় যে ভগবান্ অভক্তের অধীন নহেন।

শ্রীচণ্ডীকিশোর কুশারি।

কাশ্মীর।

অসীম সৌন্দর্য্য-রত্নাকর ভূস্বর্গ কাশ্মীরের নাম কোন্ ভারতবাসীর নিকট অবিদিত? ইহার নির্ম্মল বায়ু, সুপেয় জল, নয়ন-মনোহর উৎস, অভ্রভেদী গিরিমালা, নির্ম্মল শৈলরাজিবেষ্টিত হ্রদ, বিবিধ বর্ণের কুসুমনিচয়, সুগন্ধি কেশর, স্বভাব-সুন্দর নরনারী, মনোহর শিল্প, ত্রিভুবন-বিখ্যাত সূক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত পশমী শাল, এবং নানাবিধ কারুকার্য্যের কথা কে না শুনিয়াছে? জগতে যাহা আশ্চর্য্য, যাহা কিছু সুন্দর আছে, সকলই কাশ্মীরে বর্ত্তমান, এই ধারণা বহুকাল হইতে আমাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। দেশে বিদেশে, শত শত পুস্তকে এই দেশের প্রশংসা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। স্বনামখ্যাত ইংরাজ কবি টমাস্ মুর তাঁহার প্রণীত "লালা রুখ্" নামক কবিতায় কাশ্মীরকে অমর করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিকই সেই কবিতা পাঠ করিলে কাশ্মীরকে অমরধাম বলিয়া ধারণা হয়। একজন ইংরাজ এতই মোহিত হইয়াছিলেন, যে তিনি এক চিনার বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় ছয় মাস কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং কেবল "লালা রুখ্" পড়িতেন। স্বাস্থ্যলাভোদ্দেশে অনেক শ্বেতাঙ্গ বোম্বাই বা করাচি বন্দরে নামিয়া

একেবারে কাশ্মীরে গমন করেন এবং সেখানে নির্দ্ধারিত কাল অতিবাহিত করিয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, কাশ্মীরে স্বাস্থ্য-প্রদ জলবায়ুর গুণে সকল পীড়াই সত্বর আরোগ্য লাভ করে। সেই জন্যই ঐ সঞ্জীবনী জলবায়ুর গুণে মুগ্ধ হইয়াই তাহারা কাশ্মীরকে "জগতের স্বাস্থ্যনিবাস" (World's Sanitarium.) আখ্যা দিয়াছেন।

যে দেশের এত প্রশংসা শ্রুত হয়, সে দেশ কাহার না দেখিবার বাসনা হয়? কিন্তু ইচ্ছা হইলেই সকল সাধ সকল সময়ে পূর্ণ হয় না। "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।" নিরন্ন ভারতবাসী, যাহাদের অর্থ এবং অবকাশ দুয়েরই নিতান্ত অভাব—যাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী জীবিকানির্ব্বাহের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য ঘৃত-লবণ-তৈল-তণ্ডুল-চিন্তায় জীবনের এক তৃতীয়াংশ ভাগ অতীত হইয়া যায়, তাহারা কিরূপে নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া হৃদয়ের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবে? অনেকের অর্থ আছে কিন্তু অবকাশ নাই, আবার যাহার অবকাশ আছে তাহার অর্থ নাই। সকল সময়ে এ দুইএর একত্র সংঘটন ঘটিয়া উঠে না। আমাদেরও বহুদিন হইতে কাশ্মীর দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেও উপরোক্ত কারণে ঘটিয়া উঠে নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় একবার সুবিধা হইয়াছিল, সেবার যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। কিন্তু কাশ্মীরে সকল সময়ে যাইবার সুবিধা নাই, কেন নাই তাহা পরে বলিব। মোটের উপর অনেক অনুসন্ধানে জানিলাম, শরৎকালের প্রারম্ভে যাওয়াই প্রশস্ত। সেবারে সে সময়ে আমাদের ছুটি ছিল। আমি এবং আমার কতিপয় বন্ধু কালবিলম্ব না করিয়া শারদীয়াপূজাবসানে যাত্রা করিলাম। হাবড়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের পঞ্জাব মেলে চড়িয়া বরাবর রাওলপিণ্ডি সহরে রাত্রি আটটার সময় পৌঁছিলাম। সেখানে আমাদের কলিকাতার একটী প্রতিবাসী কর্ম্মোপলক্ষে বাস করেন, তাঁহার গৃহে অতিথি হইলাম। দেখিলাম তিনি এবং আরও কয়েকটী ভদ্রলোক একত্র মিলিয়া 'মেস' করিয়া আছেন। বহু দিবস পরে তাঁহারা স্বদেশবাসী বাঙ্গালীর মুখ দেখিয়া যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন তাহা আর কি বলিব? আমাদিগকে কোথায় রাখিবেন, কি করিয়া সুখী করিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, গল্প ফুরায় না। বাঙ্গালার অবস্থার কথা, স্বদেশী-আন্দোলনের কথা, ন্যাসন্যাল কলেজের কথা, বঙ্গলক্ষ্মী মিলের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নানা কথায় রাত্রি হইয়া গেল, চর্ব্ব্য চোষ্য নানাবিধ আহার করিয়া পরম সুখে নিদ্রা গেলাম। প্রভাতে উঠিয়া দেখি, বাবু মৎস্যের চেষ্টায় গিয়াছিলেন একটী বৃহৎ মাহসির মৎস্য আনিয়াছেন। কাজেই কমিটি বসিয়া গেল, কি করিয়া সদ্ব্যবহার হইতে পারে। এ বিষয়ে নানাপ্রকার সৎপরামর্শ চারিদিক্

হইতে বর্ষিত হইতে লাগিল, অবশেষে ঘোরতর গণ্ডগোলের পর, সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত পলাওএর ব্যবস্থা হইল। অতি পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন ব্যাপার সম্পাদিত করিয়া সহর পরিদর্শনে বাহির হওয়া গেল।

এই স্থানে রাওলপিণ্ডি সম্বন্ধীয় দুই চারি কথা বলিলে বোধ হয় পাঠক পাঠিকাদিগের অসন্তোষের কারণ হইবে না।

রাওলপিণ্ডি পঞ্জাবের অন্তর্গত সীমান্ত প্রদেশ বলিয়া ব্রিটিস গভর্ণমেণ্টের এখানে প্রধান সেনানিবাস। যুদ্ধবিগ্রহের যাবতীয় উপকরণ এখানে বর্ত্তমান। বড় বড় ইংরাজকর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে সর্ব্বদা রক্ষিত সহরটী লেহ নামক ক্ষুদ্র নদীর উভয় পার্শ্বে, এবং সমুদ্রতট হইতে ১৭৬২ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। এই নদীর উত্তরকূলে দেশী সহর; অপ্রশস্ত, অপরিষ্কার, জনাকীর্ণ রাস্তা, রাস্তার দুই পার্শ্বে পাথরের বড় বড় বাড়ি, উপরে থাকিবার স্থান, নীচে পঞ্জাবী, পেশোয়ারীদিগের বিপনি। নদীর অপর তীরে গোরা বাজার (cantonment.) ও সেনানিবাস। এখানকার রাস্তা বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কার। অনেক স্থানে উদ্যানসংলগ্ন, ইংরাজী ধরণের বাটী। একটী রাস্তার উভয় পার্শ্বে বাজার। তথায় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের আমদানি দেখিলাম। মুলতান, পেশওয়ার, লক্ষ্ণঝোলা, মরি, ধারওয়াল প্রভৃতি স্থানজাত দ্রব্যে পূর্ণ। এতদ্ভিন্ন স্থানীয় কার্পেশ ও পশমী বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে দেখিলাম।

আফিস, আদালত, বিদ্যালয়, প্রভৃতি সমস্তই এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত। কাজেই বাঙ্গালীদিগের এই পল্লীতে বাস। ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। একজন বাঙ্গালী ডাক্তার বাবুও অত্যন্ত সুযশের সহিত চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছেন।

লেহ নদীর জল কর্দমাক্ত ও অস্বাস্থ্যকর নহে বলিয়া, একটী ক্ষুদ্র শৈলের উপর, তত্রস্থ প্রস্রবণ বৃহৎ জলাধারে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। সেই জলাধার হইতে নল দিয়া সহরের জল সরবরাহ হয়। এই গিরিপ্রস্রবণের জল অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ। পূর্ব্বে এই প্রদেশের জল বায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ছিল; কিন্তু এখন প্লেগ, কলেরা ও বসন্তের প্রভাবে লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সহরের চারিদিকে বিকীর্ণ ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া ইহার প্রাচীনত্ব বেশ প্রমাণ হয়। তবে বর্ত্তমান নগর যে আধুনিক, তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। হিন্দুরাজ্য বিধ্বস্ত হইলে এই প্রদেশ গক্কর জাতির অধীনে কিয়ৎকাল ছিল; তাহার পর মুসলমানেরা উহাদিগকে পরাজিত করিয়া আপন অধীনে আনয়ন করে। পরে মোগল সাম্রাজ্যের পতনকালে এবং শিখদিগের অভ্যুদয় সময়ে শিখ সর্দ্দার গুর্জর সিংহের অধীনে এই দেশ শাসিত হইত। পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ পঞ্চনদের সিংহাসনে আরূঢ় হইলে এই প্রদেশও তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে শিখ সাম্রাজ্য বৃটিস্ সিংহের

করতলস্থ হইলে এই প্রদেশ ইংরাজ গভর্ণমেন্ট ভুক্ত হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই স্থানে বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু চরমুখে সংবাদ পাইয়া ইংরাজ পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়ায় পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। রাওলপিণ্ডি নগরে পদচ্যুত আমীর, সাহ সুজা বিতাড়িত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৮৮৫ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে লর্ড ডফারিন তাৎকালিক আমীর আবদর রহমানকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এক বৃহৎ দরবার করেন। এই রাওলপিণ্ডি নগরে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে হাঙ্গাম ঘটিয়াছিল। লোকে উন্মত্ত হইয়া গির্জা প্রভৃতি পুড়াইয়া দিয়াছিল। এই হাঙ্গাম করার অপরাধে লালা হংসরাজ প্রভৃতি কয়েক জন সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীবী স্থানীয় গর্ভমেণ্ট কর্ত্তৃক ধৃত হন। পরে মাসত্রয়ব্যাপী বিচারের পর ইঁহারা নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হন। (ক্রমশঃ)

শ্রীনৃপেন্দ্র নারায়ণ দত্ত।

গীতার ব্যাখ্যা।

গীতা জগতে অদ্বিতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ। যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থরাশি এই গীতার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। কাব্যাংশেও গীতা অতুলনীয়। ইহার অভিনেতা স্বয়ং ভগবান্ ও ভারতের অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন। স্থান কুরুক্ষেত্র। ভারতনারীগণের মধ্যে এখন ধর্ম্মভাবের শিথিলতা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। পরনিন্দা, তাসক্রীড়া এবং অলসভাবে দিন না কাটাইয়া, যদি তাঁহারা এই মহা গ্রন্থখানি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করেন এবং জীবনে তাহার ফল দেখাইতে পারেন, ভারতনারী নিজ গৃহে পুণ্যের শুভ্রালোক বিভাষিত করিতে সমর্থ হইবেন। আমি সরল ভাষায় গীতা হইতে কিছু লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

যখন দুষ্টমতি দুর্য্যোধন বিনাযুদ্ধে তাহার পিতৃব্যপুত্র পঞ্চপাণ্ডবগণকে সূচাগ্রপ্রমাণ ভূমি দিবেন না বলিয়া অন্যায় যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই আত্ম-বিগ্রহ শান্তির জন্য, যথোচিত চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কুরুক্ষেত্রের মহাসমর অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষস্থ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ নৃপতিমণ্ডল যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তরে সমবেত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়তম জ্ঞাতিকুলে যুদ্ধক্ষেত্র পূর্ণ। প্রকৃত বীরের ন্যায় সদর্পে গ্রীবা উন্নত করিয়া—

ধনঞ্জয় কহিলেন প্রভু পদ্মনাভে।
না করিব যুদ্ধ আমি ছার সব ভবে॥

আমি নিজ হস্ত জ্ঞাতিশোণিতে কলঙ্কিত করিতে পারিব না। ভিক্ষান্নলব্ধ দ্রব্যে জীবনযাপন গৌরবজনক মনে করিব। আমার হৃদয় মহাশোকে ও বৈরাগ্যে বিহ্বল হইতেছে, এই ভাব, ধরার সামান্য অধিকার কেন, সুররাজ্যের

অধিকারও বিলুপ্ত করিতে সক্ষম হইবে না। ভগবান্ বলিলেন,—

আকুলতা পরিপূর্ণ স্থির অচঞ্চল—
সমুদ্রে মিলিত হয় নির্ঝরিণীজল।
তেমনি ব্রহ্মেতে কর সব সমর্পণ,
লাভালাভ ধনঞ্জয়! করোনা গণন॥

ধনঞ্জয় তথাপি অটল রহিলেন। ভগবান্ বলিলেন, তুমি স্থিতপ্রজ্ঞা লাভ করিবে। অর্জ্জুন বলিলেন, ভগভন্! স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি?

ভগবান্ বলিলেন,

সমস্ত কামনা যেই করে বিসর্জ্জন,
আত্মাতেই আত্মানন্দ ভুঞ্জে অনুক্ষণ,
প্রজ্ঞা যার আত্মাতেই স্থির ভাবে রয়,
আত্মারাম সে সাধুরে স্থিতপ্রজ্ঞ কয়।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, কর্ম্মযোগ হইতে জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ, তবে কেন আমাকে এই ঘোরতর অপকর্ম্মে নিযুক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন।

ভগবান্ বলিলেন, কর্ম্ম না করিলে লোকে নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে পারে না।

অকর্ম্মা থাকিতে কেহ পারে কদাচিত;
স্বভাবগুণেতে জীব কর্ম্মে নিয়োজিত।

জীবকে প্রকৃতির দ্বারা বাধ্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হয়। সকলেরই কর্ম্ম করা উচিত। অজ্ঞানীরা সকাম ভাবে যে কর্ম্ম করে, জ্ঞানীরা তাহা নিষ্কাম ভাবে করেন। তুমি যে দুষ্ট শত্রুকে ক্ষমা করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিতেছ অর্থাৎ যুদ্ধে বিরত হইতে চাহিতেছ, ইহা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। অর্জ্জুন বলিলেন, ভগভন্! কোনটী সুকর্ম্ম, কোনটী দুষ্কর্ম্ম এবং কর্ম্মহীনতাই বা কি, তাহা কি প্রকারে জানিব? ভগবান্ বলিলেন, ঈশ্বরজ্ঞান লাভার্থে কর্ম্ম ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করিয়া অর্থাৎ ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করার নাম কর্ম্মযোগ। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, এ দুটীর কোনটী শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ বলিলেন, উভয়ই শ্রেষ্ঠ, তথাপি সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ, কেননা কর্ম্মযোগী সর্ব্বভূতেই পরমাত্মাকে দর্শন করে, সে কর্ম্ম করিয়াও পদ্মপত্র যেমন সলিলে অনার্দ্র-ভাবে বাস করে, কর্ম্মী কর্ম্ম করিয়াও কোন কর্ম্মে লিপ্ত হয় না।

ব্রহ্মে সমর্পিয়া পার্থ! কর্ম্মে হও রত।
না হবে পাপেতে লিপ্ত পদ্মপত্র মত॥

(ক্রমশঃ)

নিবেদন।

বামাবোধিনীর হিতৈষিণী ভগ্নীগণ সকলে বিদিত আছেন, যে বামাবোধিনী এখন পিতৃহীনা, এবং স্বর্গগত উমেশ চন্দ্রের অভাবে সে ভগিনীগণের মুখ চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য সেই সাধুপুরুষের কীর্ত্তিকে সজীব করিয়া রাখা। বামাবোধিনী কেবল অকাতরে অক্লান্তভাবে নারী-

গণের নিমিত্ত আজীবন কার্য্য করিতেছে। এজন্ত সকল ভগিনীগণ ইহার নিকট চিরকাল ঋণী। অতএব ইহাঁর প্রতিষ্ঠাতার প্রতি কি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নহে? এবং সেই কৃতজ্ঞতার অনুষ্ঠানও আবশ্যক। মানবের সদাশয়ের পরিচয় শুধু বাক্যে প্রকাশ হয় না, সংসারে উহা কার্য্যে পরিণত করার প্রয়োজন হয়। এই কর্ত্তব্য ভাবিয়া মাননীয়া ভগিনী শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা অগ্রসর হইয়া উক্ত কর্ম্মবীর সাধুর স্মৃতি রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি বিদুষী ভগিনীগণকে আহ্বান করিয়া যে সভা গঠন করেন তাহা কাহারই অবিদিত নাই, তৎকালোচিত কার্য্যও আশাজনক হইয়াছিল। ৺উমেশচন্দ্রের ভক্তশিষ্যা ও উপকৃতা ভগিনীগণ যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা ইহাই আশা হইয়াছিল যে, আমাদের স্বদেশী ভগিনীগণ বুঝিয়াছেন,—এক্ষণে আমাদের ব্রত, নিয়ম, শুভ-অনুষ্ঠান সকল কেবল অন্তঃপুরের সীমাবদ্ধ নহে। ইহা আর শুধু আপন আপন স্বামী পুত্রের কল্যাণ উদ্দেশেই সাধিত করিয়া তৃপ্তি ও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, শুধু বেশভূষায় এখন তারা অর্থ অপচয় করে না, গুণের আদর, সৎকর্ম্মের মর্য্যাদা ও সাধুর পূজা করিতে শিখিয়া তাহারা সংসার ও সমাজকে উন্নত করিতে শিখিয়াছে।

যে মহাত্মা নারীগণের শিক্ষার নিমিত্ত শারীরিক, মানসিক, আর্থিক কোন কষ্টই গ্রাহ্য করেন নাই। আজ তাঁহার অকস্মাৎ বিয়োগজনিত গুরুতর অভাব যাঁহারা প্রাণে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের উচিত শুধু বাক্যের দ্বারায় নহে, সাধ্যমত কার্য্যে প্রকাশ করিয়া, প্রকৃত সাধুভক্তির পরিচয় দেন। বাঙ্গালী পুরুষগণের একটা কলঙ্ক শুনা যাইত "বাক্যবীর," কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনে এক্ষণে সে কালিমা মুছিবার উদ্যোগ হইয়াছে। কিন্তু রমণীগণেরও কি সেই আখ্যা লওয়া অদৃষ্টে ঘটিবে। যাহারা সংসার ও সমাজের শুভদাত্রী, মঙ্গলকারিণী মহাশক্তি স্বরূপিণী, তাহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে সমুৎসুক হইলেই উন্নতির দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে।

ভগ্নী স্বর্ণপ্রভা বসু মহাশয়া ভীষণ শোক ও রোগাচ্ছন্ন হইয়াও তদী[illegible] অনুষ্ঠিত ৺উমেশচন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডারের অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য পরিশ্রম করিতে বিমুখ হন নাই। এক্ষণে বঙ্গরমণী মাত্রেরই এই সদাশয়া মহিলার সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। মহানগরী রাজধানী কলিকাতানগরী বিদুষী মহিলাগণের শীর্ষস্থানীয় ও অধিকাংশ ভগিনীরা উক্ত মহাত্মার ভক্ত। তাঁহারা এ সকল অনুষ্ঠানের উপকারিতা বুঝিয়াও কেন যে নিরুৎসাহী, তাহা বুঝা যায় না। এ সকল মহৎ ব্যাপার এক জনের দুই জনের আয়ত্তাধীন নহে। আমরা সকল ভগ্নীগণ অসাম্প্রদায়িক ভাবে একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া সদানুষ্ঠানের অনুরাগিণী

হইব। "সত্য" এক ও ধ্রুব ইহা নিশ্চিত। দলাদলি, মতান্তর এ সকল পরিত্যাজ্য। যখন আমরা সমস্ত বল একত্র করিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হইব, তখনি আমাদের দেশের অভাব মোচন হইবে।

আর্য্যনারীর সুপ্রকৃতি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে রমণী-শক্তির কার্য্যকারিতার শত শত নিদর্শন পাওয়া যায়।

আমরা অশিক্ষিতা বঙ্গনারী। অদ্য এই প্রবাসিনী দীনা হীনা ভগিনীর নিবেদন যে ৺উমেশচন্দ্র দত্ত স্মৃতি ভাণ্ডারের নিমিত্ত তথাকার উপযুক্ত শক্তিশালিনী ভগিনীগণ পুনরায় সভা আহূত করিয়া নিশ্চেষ্টগণের উদ্যম উৎসাহ জাগাইয়া তুলুন এবং সত্বর যদ্দ্বারা ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া যায়, সেই উপায় করুন।

দেবতার পূজা যেমন নিত্য বিধেয়, সাধু মহাত্মা সৎকর্ম্মশীল মানবের পূজাও তদ্রূপ নিত্য কর্ত্তব্য। এই সেই দিন আমরা সকল ভগ্নীতে বামাবোধিনীর প্রতিষ্ঠাতার ও নারীশিক্ষার পূর্ণ হিতাকাঙ্ক্ষীর নিমিত্ত অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিয়া হৃদয় বেদনা প্রকাশ করিয়াছি ও সকলেরই অন্তঃকরণে তাঁহার গুণগাথা চিরদিন সমভাবে অঙ্কিত থাকিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি, কিন্তু ভগ্নী স্বর্ণপ্রভার আদর্শ অতি উচ্চ ও অনুকরণীয়। এক্ষণে অব্যাঘাতে অবিলম্বে যাঁহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আছেন, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য পূর্ণ করিবেন ইহাই বিশেষ অনুরোধ।

বিনীতা নিবেদিকা ভগ্নী
শ্রীমনোজবা রচয়িত্রী

মিলন।

পশ্চিম দেশবাসী বাবু সুংখমল একজন অতিশয় ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁহার জমিদারী তালুক অনেক স্থানে আছে। একশত আশী খানা গ্রাম তাঁহার তালুকের মধ্যে, এতদ্ভিন্ন বাড়ী বাংলা বিস্তর আছে।

এক কথায় বলিতে গেলে তিনি একজন বেশ সম্পত্তিশালী ব্যক্তি, তাঁহার কিছুরই অভাব নাই।

তাঁহার গঙ্গাতীরবর্ত্তী সুন্দর বৃহৎ অট্টালিকা সকল পথিকের নয়ন মুগ্ধ করে। বাড়ীখানির চতুষ্পার্শ্বে মনোহর উদ্যান। সম্মুখে কত প্রকার পুষ্পবৃক্ষ রহিয়াছে, গোলাপ, বেল, চামেলি, যূঁই রজনীগন্ধা, চাঁপা, কামিনী, বকুল, টগর ইত্যাদি পুষ্পের সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত করিতেছে। এক পার্শ্বে আম জাম লিচু কাঁঠাল নাশপাতি আলুচার বৃক্ষগুলি ফলভারে নত হইয়া রহিয়াছে। উদ্যানের একপার্শ্বে একটী বৃহৎ সরোবর, তাহার জল অতিশয় স্বচ্ছ, বৃক্ষ-সমূহের

প্রতিবিম্ব পড়িয়া অতিশয় সুন্দর দেখাইতেছে, এবং স্থানটী শীতল হইয়া রহিয়াছে।

শ্রাবণের সমস্তই গত, নিদাঘের প্রখরতা আর নাই। মার্ত্তণ্ডদেব এখন গমনোন্মুখ হইয়াছেন, ধরণী নিস্তব্ধরূপ ধারণ করিয়াছে। বৃক্ষের একটীও পল্লব নড়িতেছে না। দেখিতে দেখিতে নিশাদেবী নিজ সহচরী তারকারাজির সহিত মিলিত হইয়া আকাশমার্গে উদিত হইলেন। কৃষকেরা লাঙ্গল স্কন্ধে করিয়া গাভীগণসহ নগরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

দেবালয়ে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বিগ্রহদেবের সান্ধ্য-আরতি শেষ হইল। সুরথমলের গৃহের কক্ষে কক্ষে প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। এমন সময়ে উদ্যানের সরোবর-তীরে একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা কপোলে কর বিন্যস্ত করিয়া গাঢ় চিন্তাযুক্তা হইয়া বসিয়া আছে। ক্রমেই অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, কিন্তু বালিকা তথাপি উঠিল না। ধীরে ধীরে শীতল সমীরণ বহিতে লাগিল, এবং আকাশে মেঘ দেখা দিল। বায়ুর সন্ সন্ শব্দে পৃথিবী ধূলীময় হইয়া উঠিল, এবং মেঘ-গর্জ্জনের সহিত দুই চারি ফোঁটা করিয়া বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। কিন্তু বালিকার চিন্তা অপসৃত হইল না। এমনই অন্য-মনস্ক-ভাবে বসিয়া রহিয়াছে যে, বাহ্যদৃশ্যের প্রতি কিছুই লক্ষ্য নাই। এরূপ সময়ে আর একটি সুন্দরী পশ্চাদ্দিক্ হইতে আসিয়া অতি ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন, "কিশোরী ভাই! তুমি এখানে রহিয়াছ? আমি সকল স্থানে তোমাকে অন্বেষণ করিয়া কোথাও না পাইয়া অবশেষে এখানে আসিলাম। এই ঘোর অন্ধকার, বৃষ্টি পড়িতেছে, আর তুমি এখানে একাকী বসিয়া আছ, তোমাকে না দেখিয়া মাতা-ঠাকুরাণী সেই পর্য্যন্ত অতিশয় ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন, এস শীঘ্র গৃহে যাই।"

এই কথা শুনাতে কিশোরীর চমক ভাঙ্গিল এবং অতি বিষন্নভাবে বলিল, "যমুনা! মা কি আমাকে খুঁজিতেছেন?" যমুনা বলিল, "সই! ভেবে ভেবে আর কি করবি বল্। এই এমন ঠাণ্ডা, আর গায়ে জল পড়্ছে, আজই যে অসুখ কর্ব্বে। শরীরের প্রতি একটু দৃষ্টি রাখ, মায়ের প্রাণে আর দুঃখ দিস্‌নে ভাই।" কিশোরী আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "ভাইত এতখানি যে রাত্রি হইয়াছে, ও মেঘ করিয়াছে, আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যমুনা তোর কাছে আমার কিছুই লুকানো নাই, ভাই, সকলি জান, আমার শরীর থাকায় আর কি সুখ, কেবল মা বাবার জন্যই কষ্ট হয় যে, পাছে আমার এরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁদের মনে আঘাত লাগে, সেই জন্যই আমি উহাঁদের সম্মুখে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াই। কিন্তু যমুনা আর আমি পারি না, যার জন্য এ দেহ মন প্রাণ দিবারাত্রি জ্বলিতেছে সে একবার ফিরিয়াও দেখেনা, তবে আর এ জীবন ধারণে প্রয়োজন কি?" এই বলিতে বলিতেই খুব জোরে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তখন কিশোরী ও যমুনা উভয়ে

দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে চলিল। এখন কিশোরী ও যমুনার পরিচয় দি।

সুরথমলের সংসারে তাঁহার স্ত্রী সুচিন্তা ও একমাত্র কন্যা রাজকিশোরী। তাঁহার পুত্রসন্তান না থাকায়, কিশোরী মা বাপের অতিশয় স্নেহের পাত্রী ছিল।

যমুনা কিশোরীর সখী, দুজনে তারি ভাব, উভয়ে উভয়কে না দেখিলে এক দণ্ড থাকিতে পারে না, দেখিতেও উভয়ে একই প্রকারের। কিশোরী যেমন রূপবতী, গুণবতীও তদ্রূপ। সুরথমল স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, এবং নিজেও অতিশয় জ্ঞানবান্ এবং বুদ্ধিমান্ পুরুষ। এজন্য স্ত্রী ও কন্যাকে যথোচিত শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহাতে আবার কিশোরী পিতা মাতার একমাত্র সন্তান, সেজন্য তাহার উপর সমস্ত ভালবাসা, এবং রীতিনীতি শিক্ষাও খুব ভাল করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর সকল বিষয়ে কাহাকেও সুখী করেন না।

কিশোরীর কোন বিষয়েরই অভাব ছিল না, কেবল এক বিষয়ে সে অতিশয় অসুখী, কিশোরী একমাত্র সন্তান বলিয়া সুরথমল ও সুচিন্তার ইচ্ছা ছিল না যে, তাহার বিবাহ দিয়া আপনাদের নিকট হইতে দূর শ্বশুরালয়ে পাঠান, তাহাতে উভয়ের অতিশয় কষ্ট হইবে ভাবিয়া এরূপ স্থানে পাত্র স্থির করিয়াছিলেন যাহাতে, কিশোরী তাঁহাদের নিকটেই আজীবন থাকে। সৌভাগ্যবশতঃ সুরথমলের মনোবাঞ্ছাপূর্ণ হইয়াছিল।

তাঁহার জামাতার পিতা মাতার কেহই বর্ত্তমান ছিল না এবং পৈতৃক সম্পত্তিও বিস্তর ছিল। ছেলেটী দেখিতে শুনিতে ভাল, লেখা পড়াও করিতেছে এই সমস্ত দেখিয়া কিশোরীর সহিত অতি সমারোহে বিবাহ দিয়াছেন এবং আপনার নিকট লইয়া আসিয়াছেন। ইচ্ছা যে, খুব ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখাইয়া আপনাদের কাছে রাখিবেন।

সুরথের পুত্র সন্তান ছিল না, কাজেই কিশোরী তাঁহার সকল বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইবে।

কিন্তু মানুষে যাহা ভাবে তাহা হয় না, সুরথেরও সকল মনোমত হইয়াছিল, কেবল জামাতা তেজকুমার কন্যাকে ভাল না বাসাতে তাঁহার মনে বড় কষ্ট ছিল, এবং সেই দুঃখই কিশোরীর মনঃপীড়ার কারণ। কেন যে এরূপ, কেহই বলিতে পারে না।

এদিকে তেজকুমারের স্বভাব চরিত্র অনিন্দনীয়, কোনরূপ দোষ ছিল না এবং দয়া, ধর্ম্ম, ভক্তি, ভালবাসাও যথেষ্ট ছিল, কেবল কিশোরীর প্রতি তাদৃশ অনুরাগ না থাকাতে সকলেই অসুখী হইয়াছিল। সুচিন্তাও সর্ব্বদা ভাবিতেন কেমন করিয়া জামাতার মন ভাল হইবে, কত ঠাকুর দেবতার পূজা করিতেন, যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, সকল সময়েই তিনি সেই চিন্তাতেই থাকিতেন।

প্রতিবাসিনীদের জিজ্ঞাসা করিতেন, তেজকুমারের কেন এরূপ হইল। তাঁহারা

বলিতেন, "বিবাহের সময় যখন স্ত্রী-আচার হয়, সেই সময় 'ছাঁউনি নাড়া' ফুল যদি কেহ মন্দ অভিপ্রায়ে সরাইয়া লয়, তাহাতেই এরূপ হয়। তা আমাদের বোধ হয় রাজকিশোরীরও তাহাই হইয়াছে। তা না হলে তোমার জামাইয়ের স্বভাবও খুব ভাল, এমন কেন হবে, কোন্ চোক্‌খাগি এইরূপ করেছে"।

সুচিন্তা প্রতিবাসিনীদের নিকট ইহা শুনিয়া অতিশয় ম্রিয়মাণা হইতেন এবং বলিতেন,—"বোন্! তোরা কেউ বল্‌তে পারিস্ কি করে এ ভাল হয়।" একদিন প্রতিবেশিনীদের সহিত একটী বৃদ্ধা আসিয়াছিলেন, তিনি ইহা শুনিয়া বলিলেন, "হাঁা বৌমা! আমরাত কিছুই জানিনে, তবে আমাদের পাড়ায় জগতসিংহের মেয়ের নাকি ঐরূপ হয়েছিল, তাই তার ভাই কোথা থেকে একটা শীকড় এনে দেয়, উহা ধারণ করিলে 'স্বামী বশ' হয়। আর তাতে তার খুব উপকার হয়েছে। নামটা যে মনে আসছেনা, আ মর! ঐ যে বলে, কি ব'লে 'বশীকরণ', মেয়েকে জামাই ভালবাসে, যা মানত করে তাই পায়।" ইহা শুনিয়া একটী যুবতী পরিহাস করিয়া কহিলেন, "ঠানদিদি! তুমি কেন আনিয়ে ঠাকুরদাদাকে বশ করনা।" ঠান্‌দিদি বলিলেন, "আমার আর বুড়ো বয়সে কি হবে, তোরা সব কর, তোদেরি এখন চাই, আমরা দেখি। বৌমা! তোমাদের যমুনা সকল সংবাদ জানে, তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর"।

ইহা শুনিয়া গৃহিণীর যমুনাকে ডাকিতে আদেশ হইল। লছমনিয়া দাসী ডাকিতে গেল এবং পথিমধ্যেই কিশোরী ও যমুনার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিল, তাহাদের মাতাঠাকুরাণী ডাকিতেছেন। কিশোরী ও যমুনা বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াছিল, সেজন্য কিশোরী প্রথমেই নিজ কক্ষে গিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিল এবং যমুনাও কাপড় ছাড়িয়া লইল। তখন দুই সখীতে মাতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুচিন্তা কিশোরীকে দেখিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে মা? এই অন্ধকার, বৃষ্টি পড়ছে, বোধ করি ভিজে গিয়েছিস্।" কিশোরী বলিল, "মা আমরা বাগানে পুকুরের ধারে বসেছিলাম, বৃষ্টি পড়িতেই উঠিয়া আসিয়াছি, এবং আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছি, বলিয়া, মাতার নিকট উপবেশন করিল এবং যমুনা তাহার পার্শ্বে বসিল।

গৃহিণী যমুনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যমুনা! তুমি নাকি জান, আমাদের পাড়ার সিংহের মেয়েকে এক রকম কি ওষুধ দিয়েছে, তাতে উপকার হয়।" যমুনা উত্তর করিল, "হাঁ মা! আমি জানি সিংহের মেয়ে শ্যামরাণীর ভাই কলিকাতা বেড়াইতে গিয়াছিল, সেখান থেকে কি পুঁথি এনেছে, তাই সকাল সন্ধে পড়ে ও সেই রকম জোরে কি করে, তাতেই খুব উপকার। মা আমাদের কিশোরীর জন্য আনাওনা।" গৃহিণী বলিলেন, "কর্ত্তাকে বলিয়া আনাইব"।

নগরের এক প্রান্তে বৃক্ষলতায় আচ্ছাদিত একটী কুটীরে দুই ব্যক্তি উপবেশন করিয়া আছেন। একের দেহ গৈরিক বসনে আচ্ছাদিত, তিনি মৃগচর্ম্মাসীন। বয়ঃক্রম পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু শরীরে বল বীর্য্য যথেষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে। সম্মুখে শ্রীমদ্ভগবৎগীতা খোলা রহিয়াছে, ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এরূপ সময়ে অপর যুবাপুরুষটী আসিয়া দূরে কুশাসনোপরি বসিয়া একমনে সাধুপুরুষের মুখনিঃসৃত ভগবৎ মাহাত্ম্য শ্রবণে চিত্তনিবেশ করিয়া আছেন।

যখন তাঁহার পাঠ সাঙ্গ হইল, পুস্তক হইতে মুখ উত্তোলন করিতেই যুবা উঠিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। সাধুপুরুষ, "তেজকুমার কুশলে আছত ?" বলিয়া যুবাকে বসিতে আদেশ করিলেন। তেজকুমার দ্বাবিংশবর্ষীয় যুবক, গৌরবর্ণ, আয়ত লোচনে দীপ্ত উৎসাহ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বলিলেন, "গুরুদেব ! আপনার কৃপায় সকলি শুভ, কেবল আমার প্রাণের একমাত্র বাসনা যাহা, আপনার অবিদিত নাই "জননী জন্মভূমির" দুঃখ দূর করা। এই ব্রত যে দিন হইতে লইয়াছি, সেই চিন্তাই আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছে। পাঠে মনোনিবেশ করিতে পারি না, এমন কি আমার পত্নী কিশোরীর সম্বন্ধেও যথোচিত কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি। সেও আমার এরূপ ব্যবহারে আশ্চর্য্য ও মর্ম্মাহতা হইয়া আছে। এখন কিরূপে আমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে তাহারই উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করুন। গুরুদেব তেজকুমারের বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদুহাস্য করতঃ কহিলেন, "বৎস ! তোমার সঙ্কল্প মহৎ, ইহাতে তোমার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না, কিন্তু পুত্র ! ইহা কি একদিনের, কিম্বা একটী লোকের দ্বারা সম্পন্ন হইবার কার্য্য ? তবে তোমাকে উপদেশ দিতেছি, প্রথমতঃ তুমি সর্ব্বসাধারণকে "একতা" মহামন্ত্র শিখাইতে পার ও তাহাতে যদি সফলকাম হও, তাহা হইলে জানিবে বৎস ! দুঃখিনী জননীর উদ্ধারসাধন নিকটপ্রায়। অতএব তুমি নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে গিয়া "গৌর যেরূপে নদীয়ায় হরিনাম বিলাইয়াছিলেন," তুমি সেইরূপে "একতা মন্ত্র" প্রচার কর, ও সকল লোকের হৃদয়ে যাহাতে ঐ বাণী দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয় তাহারই চেষ্টা কর, তাহাতে কালবিলম্ব করিও না। আর এক কথা বলিব, তুমি আমার মা লক্ষ্মীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। তোমার গোড়াতেই ভুল দেখিতেছি। স্ত্রী স্বামীর সকল বিষয়েই সহকারিণী, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সম্পদে, বিপদে। তোমার শরীরমনের অর্দ্ধেক অংশ তাহাতে রহিয়াছে। অতএব তুমি তাঁহাকে ছাড়িয়া কিরূপে কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হইবার বাসনা করিতেছ ? তুমি বুদ্ধিমান্, তোমার বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি আছে জানিয়া অধিক আর বলিতে চাহি না, এখন তুমি গৃহে যাও এবং যাহা যাহা বলিলাম তাহারই অনুষ্ঠান কর।" এই বলিয়া সাধুপুরুষ ধ্যানমগ্ন

হইবার উপক্রম করিলেন। তেজকুমার প্রণিপাতপূর্ব্বক বিদায় লইলেন।

যমুনা স্বামার নিকট হইতে তাহার ভাই যে পুঁথী আনিয়া দিয়াছে, তাহা লইয়া আসিয়া কিশোরীকে দিয়াছে, কিশোরী পুস্তক লইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছে, ঠিক্ সেই সময়েই তেজকুমার সেই কক্ষে ধীর পদবিক্ষেপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দূর হইতে অনিমেষ লোচনে কিশোরীর সৌন্দর্য্যসুধা পানঃ করিতে লাগিলেন। কিশোরী এমন ভাবমগ্ন হইয়া পাঠ করিতেছিল যে, তেজকুমারের আগমন কিছুই জানিতে পারে নাই। তাহার আলুলায়িত কুন্তলরাশি, অযত্ন বিন্যস্ত হইয়া কপালে ও গণ্ডদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পরিধানে একখানি সামান্য কালাপেড়ে স্বদেশী শাড়ী, হস্তে কয় গাছি চুড়ি, ও গলায় একটী সূক্ষ্ম স্বর্ণহার (ইহা তাঁহার মাতার নিতান্ত অনুরোধ অপচ্যুত করিতে পারিতেন না)। ইহাতেই কিশোরীর দেহের লাবণ্য সমধিক উজ্জ্বল দেখাইতেছে। চিন্তাক্লিষ্ট মলিন মুখ, তবুও তাহাতে কত সুষমা বিরাজ করিতেছে।

তেজকুমারকে তদবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে হইল না, হঠাৎ বায়ুর বেগবশতঃ দ্বার বন্ধ হইয়া গেল, ও সেই শব্দে কিশোরী চমকিয়া যেমন মস্তকোত্তোলন করিল অমনি চারি চক্ষুর মিলন হইয়াই পুনরায় নত হইয়া গেল। বিবাহের পর এই ভাবে এই প্রথম দর্শন।

কিশোরী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এই পুস্তকের এমনি কোন গুণ অবশ্য আছে যদ্বারা তাহার আকর্ষণে তেজকুমারকে তাহার নিকটে লইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তিনি মুখে কিছুই বলিতে পারিলেন না, প্রেমপূর্ণ লজ্জা তাহাকে বাধা দিল। তেজকুমার ধীরে ধীরে আসিয়া কিশোরীর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং তাহার মৃণালসদৃশ কোমল হস্ত দুইখানি নিজ হস্তে লইয়া অতি করুণস্বরে কহিলেন, "কিশোরী! তোমার প্রতি এতদিন অতিশয় অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। বল প্রাণাধিকে! আমায় ক্ষমা করিবে কি?" কিশোরী কি বলিবেন, তাঁহার আনত লোচনযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা বহিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল ভিজিয়া গেল। তাঁহার বাক্যকথনের ভাষা মুখে বলিবার সামর্থ্য রহিল না।

তেজকুমার তখন কিশোরীর অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডল সাদরে মুছাইয়া বলিলেন, "কিশোরী! আর কাঁদিওনা, তোমার চক্ষের জল আমার হৃদয়ে অতিশয় বেদনা দিতেছে, আজ হইতে তোমার সকল কষ্টের অবসান হইল। তুমি আমার সকল দোষ ভুলিয়া যাও। আমার জীবনের আজ পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। গুরুদেবের কৃপায় চক্ষুরুন্মিলনের অবসর ঘটিয়াছে। কিশোরী! তুমি বালিকা হইলেও মহাশক্তির অংশ, আমি তোমার বল না পাইলে সংসারে উন্নতি করিতে পারিব না। আমার দাম্পত্যজীবন এতদিন অসম্পূর্ণ ছিল

আমি কি ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম, তাহা বলিয়া জানাইবার আবশ্যক নাই। তুমি দেখিতেই পাইয়াছ অবনতির স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিলাম। কিশোরী তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিল, "কেন তুমি এত অনুতাপ করিতেছ? হতাশ হইবারও কোন কারণ নাই, এখনি কি সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমাকে তুমি যে পথে লইয়া যাইবে আমি নির্ভয়ে অগ্রসর হইব। গৃহে বাহিরে, সমাজে, সংসারে, অথবা ইহলোকে পরলোকে হউক আমি চিরসঙ্গিনী চিরদাসী"। তেজকুমার হর্ষবিস্ময়ে মগ্ন হইয়া কিশোরীর হস্তস্থিত পুস্তক লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি বই," খুলিয়া দেখেন "পতিব্রতাধর্ম্ম"।

এমন সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, একদল গৈরিকবসনধারী যুবক সঙ্কীর্ত্তন লইয়া বাহিরের প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়াছে। মাতাঠাকুরাণী আপনাদিগকে ডাকিতেছেন। ইহা শুনিয়া তেজকুমার সত্বরে সেই সন্তানের দলকে অভ্যর্থনা করিতে গেলেন।

নূতন সংবাদ।

বাঙ্গলা সংক্ষেপে লিখন প্রণালী—গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন—এখন হইতে পুলিশের লোকদিগকে বাঙ্গলার সংক্ষেপলিখন প্রণালী শিক্ষা দিতে হইবে। ইহাতে ইংরাজী সর্টহ্যাণ্ড প্রণালীর ন্যায় বাঙ্গলায় বক্তৃতা দিলে তাহা দ্রুত লিখিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

স্ত্রীলোকের সম্মান—ডাক্তার অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বম্বের আঞ্জুমান ইসলামিয়া সভার সমাজসংস্কার উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া, বোম্বায়ের গবর্ণরের পত্নী কর্ত্তৃক এই উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে অবস্থিতি করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি বোম্বাই হইতে সুরাট, বরোদা ও আহম্মদাবাদে সমাজসংস্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

অর্দ্ধোদয় যোগ ও স্বেচ্ছাসেবক—কলিকাতার পুলিশ কমিশনার, রেলের ষ্টেশন মাষ্টার প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের বড় বড় কর্ম্মচারীরা স্বেচ্ছাসেবকদের অসীম স্বার্থত্যাগ ও যত্ন দেখিয়া ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন। স্বেচ্ছাসেবকদিগকে ধন্যবাদ দিবার জন্য কলিকাতার সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ মেরী কার্পেণ্টারহলে ভলণ্টিয়ারদিগকে আহ্বান করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন।

দান—এলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতালে একটী রোগীর ব্যয় নির্ব্বাহার্থ শ্রীযুক্ত মথুরা নাথ ভট্টাচার্য্য তাঁহার পিতা ৺মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্নের নামে তিন হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

গঙ্গার ঘাটে স্ত্রীলোকদের স্নানের জন্য এক ঘাট প্রস্তুত করিবার জন্য বাবু রামচন্দ্র গোয়েন্কা ৭৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ছোট লাট গত সোমবার সেই ঘাটের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন।

পোর্টুগালে অরাজকতা—সম্প্রতি ইউরোপে পোর্টুগালে তথাকার রাজা, রাণী ও যুবরাজ এক গাড়ীতে চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন, পথিমধ্যে রাজদর্শনের জন্য অনেক লোকসমাগম হয়। জনতার মধ্য হইতে ক্রমান্বয়ে তিন জন লোক রাজার গাড়ীতে গুলি নিক্ষেপ করিয়া রাজা ও যুবরাজকে হত্যা করে। সৌভাগ্যক্রমে, গুলি রাণীর গায়ে লাগে নাই। এই হত্যার কারণ কিছুই জানা যায় নাই। এই দুর্ঘটনায় সকলেই চমকিত হইয়াছেন।

মৃত্যু—কলিকাতা পাইকপাড়ার কুমার সতীশ চন্দ্র সিংহ গত মাঘ মাসে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি একজন প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী ছিলেন এবং স্বেচ্ছাসেবকদল গঠনের একজন প্রধান নেতা ছিলেন।

সরস্বতীপূজা—গত সরস্বতীপূজার দিন মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীদিগের পূজা দর্শনার্থ বড়লাটপত্নী লেডী মিন্টো লেডী ভায়েলেট ইলিয়ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া বিদ্যালয় দর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

মহিলাসমিতি — অর্দ্ধোদয়যোগের স্বেচ্ছাসেবকদিগকে তাহাদের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকারার্থে ধন্যবাদ দিবার জন্য কলিকাতা মহানগরীর সম্ভ্রান্ত মহিলারা গত ২৩এ মাঘ মেরী কার্পেণ্টর হলে মিলিতা হইয়াছিলেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়ের পত্নী সভাপত্নীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নূতন আইন—বিলাতে আইন পাশ হইয়াছে যে, ষোল বৎসরের নিম্ন বয়স্ক কোন বালক ধূমপান করিলে সে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া চরিত্র সংশোধন বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইবে। এই আইনের প্রচলন এখানে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

দান—পোস্তার রাণী শ্রীমতী কস্তুরী মঞ্জরী দাসী বেলগেছিয়ার এল্‌বার্ট ভিক্টর হাঁসপাতালের দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ১৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

খুলনা প্রদর্শন—খুলনার শিল্প প্রদর্শনী মেলা উপলক্ষে তত্রত্য জজপত্নী শ্রীমতী গালিত প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন।

বামারচনা।

গৌরী-কুণ্ড।

১

পুণ্যময়ী গৌরী-কুণ্ড প্রণমি তোমায়
তোমার নির্ম্মল-নীরে,
তোমার পবিত্র তীরে,
সুরাঙ্গনা সিক্ত-হস্তে শুক্লতা ছড়ায়।

২

মস্তকে কেদারেশ্বর, নিয়ে ভাগীরথী
মধ্যে তুমি সুসলিলা,
চারিদিকে বাঁধাশিলা,
সম্মুখে শতেক সিঁড়ী কে রেখেছে গাঁথি।

৩

(তব) দক্ষিণে শ্মশান ঘাট, নীলকণ্ঠ বামে,
ক্ষুদ্র ও বৃহদাকার,
কোটি শিব চারিধার,
শ্রবণ-ইন্দ্রিয় তৃপ্ত কল কল গানে।

৪

তোমার নির্ম্মল-নীরে মৎস্য কেলি করে,
খেলাইবে হংসকুল,
অর্ঘ্য খায় দলে দুল,
সমীর মেদুরে বয়, শান্তি পরে ঝরে।

৫

কাশীধামে গৌরী-কুণ্ড অতি মনোরম,
গঙ্গাতীরে অপরূপ,
সৌন্দর্য্যের শতরূপ,
বেগবতী জাহ্নবীর নাভি-পদ্ম সম।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

দানের পূর্ণতা।

সৈকতের পদতলে অর্পে নদী প্রতিদিন
হৃদয়ের পূজা সমাচার,
ধরারে প্রদানে তরু, স্নিগ্ধ আলিঙ্গনময়
অবারিত দুয়ার সম্ভার।
শূন্যেরে শবদ দেয়, নিত্য নব ছন্দময়
কত গীত কত মোহ তান,
দিবস জগত কাছে করে নিত্য নিবেদন,
আলোকের উপকার দান।
ধরণী বসন্তে দেয় হরিত বসনময়
মঞ্জুরিত যৌবন চেতন,
অনিল আকাশপদে, দেয় নিত্য বিলাইয়া
উথলিত পরাণ আপন।
ফুল সে ঝরিয়া পড়ি সমাপ্ত জীবন গাথা
দেয়গো তরুর পদতলে,
হরষে বিটপী দেয় স্বপ্নালস ছায়াখানি
তার মধুর শয্যার তরে ঢেলে,
ঊর্ম্মি দেয় অবিশ্রাম উদার আনন্দবার্ত্তা
পার্শ্ববর্ত্তী সখাটীরে তার,
নীরব দিগন্ত দেয় বিস্তৃত আশ্রয় খানি
প্রতিধ্বনিটীরে বার বার।
আঁধার নিশীথ কাছে করেগো সম্ভ্রম-রেত
ঘন স্নিগ্ধ ছায়াটীরে দান,
বিশ্বের দুয়ারে নিত্য প্রকৃতি দানেগো
হাসি
সৌন্দর্য্যের সব দীপ্তি গান।
এ সব দানের হায়! সার্থক কোথায় কবে
দুটী হৃদয়ের দুটী গান,
নাহি হয় যতক্ষণে, অমর মিলন গানে
পরস্পরে আদান প্রদান।

লজ্জাবতী বসু

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও শ্রীসুকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন
হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 535. March, 1908.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৫ বর্ষ। ৫৩৫ সংখ্যা। | ফাল্গুন, ১৩১৪। মার্চ্চ, ১৯০৮। | ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানদান—দ্বারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী আগারের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক ফেলো নির্ব্বাচিত হইবেন।

সামরিক দণ্ড—রুষ জাপানের যুদ্ধের সময় পোর্ট আর্থার বন্দরে পরাজিত হইয়া যে সকল রুষ সেনাপতি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, সামরিক বিচারে তাঁহাদের মধ্যে জেনারেল রিস এবং ফক এই দুই জন সেনাপতির প্রাণদণ্ড এবং জেনারেল ষ্টোশিল ও মিরলফের দশ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

পাবনা জেলা সমিতি—পাবনা জেলা-সমিতির অধিবেশন ২৮শে ও ২৯শে মাঘ শেষ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়স্পর্শিনী বক্তৃতায় সকলেই চমৎকৃত হইয়াছেন।

মৃত্যু—পঞ্জাবের ছোটলাট সার ডেন্‌জিল ইবেটসন্—যিনি লালা লজপৎ রাও ও সর্দ্দার অজিত সিংহকে নির্ব্বাসিত করিয়া ছিলেন—ছুটী লইয়া স্বদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন। সেখানে পৌঁছিয়াই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

বিধবা বিবাহ—১২ই ফাল্গুন সোমবার হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি অনরেবল্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। এত কালের পর বঙ্গের পুণ্যশ্লোক মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শবসাধনার ফল ফলিল। বালবিধবার বিবাহই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। তিনি সর্ব্বপ্রথমে একটী বালিকার বৈধব্য দর্শনেই

মর্ম্মবেদনায় পীড়িত হইয়া এই শুভকার্য্যে নিজের দেহ, মন, ধন, প্রাণ, আত্মা সমর্পণ করেন। আশুতোষ বাবুর কন্যার, ৯ বৎসর বয়সে, ৺বঙ্কিম চন্দ্রের দৌহিত্রের সহিত বিবাহ হয়। অল্পদিন পরেই কন্যাটী বিধবা হয়। এক্ষণে কন্যার বয়স ১৩ বৎসরের অধিক নহে। পাত্রটী সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ যুবক। জজ আশুতোষ বাবু কৌলীনামর্য্যাদায় বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভায় ও পদ-গৌরবে ভারতে তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজি ধর্ম্ম-বীর তেজস্বী মহাত্মা আশুতোষ যে দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তাহা বিধবা-বিবাহের ইতি-হাসে চিরস্মরণীয়। এক্ষণে আশা করা যায়, তাঁহার এই মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে সাধারণে কুণ্ঠিত হইবেন না। যখন দেখিতে পাওয়া যে, অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ পত্নীবিয়োগে আবার বিবাহ করিতে পরাঙ্মুখ নহেন, তখন বালবিধবাদিগের জন্য কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করাকে উন্মত্তপ্রলাপ বলিয়াই মনে হয়। বঙ্গ-সমাজের বহুতর গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সর্ব্বান্তঃকরণে এই বিবাহে যোগ ও সহানুভূতি দান করিয়াছেন। দয়াময় জগদীশ্বর এই নব দম্পতীর উপর অশেষ কল্যাণরাশি বর্ষণ করুন।

সিরাটে বৈশ্য আগরওয়ালা বংশে শ্রীমতী গঙ্গাদেবী-নাম্নী একটী ঊনবিংশ-বৎসর-বয়স্কা বিধবার সহিত লালা নিয়াধর সিংহ নামক ২৪ বৎসরের এক যুবকের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

বিলাতে ভারতীয় ছাত্রাবাস—বিলাতে এডিনবরায় ভারতীয় ছাত্রদিগের বাসের জন্য বাটী নির্ম্মাণার্থ অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত তত্রত্য কতিপয় সদাশয় মহিলা যে মেলার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে খরচ বাদে ৮৬৫৫ টাকা আয় হইয়াছে। তদ্ভিন্ন যুবরাজপত্নী, মিঃ বেলফোর, মিঃ এস-কুইথ, লর্ড রিপন, লর্ড ল্যান্সডাউন, লর্ড রে, ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা, ভিজিগাপটমের মহারাণী ও ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাণী ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

মহিলা-শিল্প-মেলা—আগামী ২০শে মার্চ্চ শুক্রবার কলিকাতা বেথুন কলেজে মহিলা-শিল্প-সমিতির উদ্যোগে ময়ূরভঞ্জের মহারাণীর অধিনেত্রীত্বে একটী বিরাট মহিলা-শিল্প-মেলার অধিবেশন হইবে। ছোটলাট-পত্নী লেডী ফ্রেজার মেলার দ্বার উদ্ঘাটন করিবেন। এই মেলা তিন দিন মাত্র থাকিবে এবং ইহাতে আদৌ পুরুষের প্রবেশাধিকার থাকিবে না। কেবলমাত্র স্বদেশ-জাত দ্রব্যই ইহাতে প্রদর্শিত হইবে। প্রদর্শনীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ দুঃস্থ ও অনাথা স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত ব্যয় করা হইবে।

ভক্তকবি তুলসীদাস।

অলৌকিক সাধুগণেরই চরিত্র অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ। অনন্ত লীলাময় হরি যে আধারে অস্মলীলা প্রকাশ করেন, তাহা যে অলৌকিক হইবে, বিচিত্র কি? ঈশ্বরের লীলাভূমি মহাত্মারা দর্শন-বিজ্ঞান-গণ্ডীর বহির্ভূত, যুক্তি-তর্কের অতীত; মানবের বুদ্ধি ও কল্পনা তথায় পরাভূত। এ দেশে কোনও মহাত্মারই ঐতিহাসিক বিবরণ নিঃসংশয়রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। প্রাচীন আচার্য্যেরা কেহই নিজ নিজ গ্রন্থে আপনাদের লৌকিক পরিচয় দিয়া যান নাই। তাঁহারা আত্মপরিচয় দিবেন কি, সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইয়াই জ্ঞানচর্চ্চায় ও লোকশিক্ষায় নিমগ্ন থাকিতেন, এবং এই মহাযোগে সিদ্ধি লাভ করিলেই আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিতেন। অতএব তুলসীদাস বিষয়ে ধারাবাহিক সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করা অসম্ভব। প্রচলিত কিংবদন্তী বা প্রবাদ-বাক্য, মহাজনগাথা, এবং তদীয় গ্রন্থের স্থানে স্থানে ঘটনাবিশেষের আভাসমাত্র অবলম্বন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইল।

মহাত্মা তুলসীদাস ভক্তিযোগে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। তিনি সদা সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যেই ভগবৎসত্তা ওতপ্রোতভাবে অনুভব করিতেন। এক ফকির ঈশ্বরকে অলক্ষ্য ভাবিয়া সর্ব্বদাই "অলক্ষ্য অলক্ষ্য" বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। সে ব্যক্তি তুলসীর নিকট আসিয়া ঐ কথা বলায়, তুলসী বলিয়া উঠিলেন;—"রে নির্ব্বোধ! যে দয়াময়ের অস্তিত্ব সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ও মন-প্রাণ-আত্মার প্রতি অংশে প্রতিক্ষণ স্বতই প্রত্যক্ষ হইতেছে, যাহা জাগতিক পদার্থের অণুরেণুতে জাজ্বল্যমান, সেই নিত্য সত্যই যদি অলক্ষ্য, তবে এ জগতে লক্ষ্য কি? রে মূঢ়! ভগবানের নাম জপ কর, তাঁহাকে দেখিতে পাইবি।"

তুলসীর এক একটী গাথা (দোঁহা) বৈকুণ্ঠচ্যুত অমৃতবিন্দুর ন্যায় পাপিতাপীর সন্তাপ হরণ করে। আধ্যাত্মিক মহিমায় তুলসী-গাথা অতুলনীয়, উপমাসৌষ্ঠবেও উহা নিরুপম। ভাবের অবতারণায় ও উহার পূর্ণ বিকাশে তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হিন্দিভাষায় তিন জন মহাকবি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ,—তুলসীদাস, সুরদাস ও কেশবদাস। তন্মধ্যে ওজস্বিতায় সুরদাস, মাধুর্য্যে তুলসীদাস প্রধান; তৃতীয় মহাকবি কেশবদাস, সুরদাস ও তুলসীদাসের নিম্নে। নিম্ন-লিখিত মহাজন-গাথায় এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা;—

"সুর সুরয তুলসী শশী উড়ু সম কেশবদাস।
অবকে কবি খদ্যোতসম যঁহ তঁহ করহি
প্রকাশ॥

সুরদাস সূর্য্যসম ভুবনে প্রকাশ,
শশিসম তুলসীর মধুর বিলাস,
সুকবি কেশবদাস তারকার প্রায়,
খদ্যোত-সমান অন্য কবি সমুদায়।